এক সমুদ্দুর অনেক ঢেউ

আশাপূর্ণা দেবী

সংযোগ
১৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক
১৩৭০

প্রকাশক
কালী কিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
সংযোগ
১৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
নির্মলকৃষ্ণ পাল
নির্মল মুদ্রণ
৮, ব্রজদুলাল স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক
ব্লকম্যান

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
দি নিউ প্রাইমা প্রেস

দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা

নবোদিত সাহিত্যিক

শ্রীমান মোহনানন্দ গুপ্তকে—

আশা দিদা

ব্যস্ ফুরিয়ে গেল বেড়ানো! সুরু হয়ে গেল ফেরার তোড়জোড়! দু'মাস একমাস নয়, কুড়ি কি পনেরো দিনও নয়, মাত্র চারদিন। চারটি দিন মাত্র সমুদ্র দেখতে পেল শানু। এক্ষুনি ফেরার জন্যে ফের বাক্স-বিছানাগুলো বাঁধা হচ্ছে।

ফেরা মানেই তো সেই বিচ্ছিরি কলকাতায়, যেখানে একবার একলা রাস্তায় বেরোবার জো নেই। এক সময়ও যা খুসি তা করবার উপায় নেই।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সেই কলকাতাই যদি এত ভাল লাগে তোমাদের তো এত ঘটা করে আসা কেন! দু'মাস আগে থেকে তো কথা চলছে। মা-তে আর বাবাতে রোজ একবার করে তর্ক আর পরামর্শ।

বাবা বলেন, 'দেশের বাড়ী', মা বলেন, 'দীঘা'!

দীঘা দীঘা!

এই অদ্ভুত সুন্দর নামটা জীবনে সেই প্রথম শুনল শানু। তবু তখনো জানত না জায়গাটা কত সুন্দর! উঃ ভাগ্যিস মা তর্কে আর ঝগড়ায় জিতেছিলেন তাই না শানুর জীবনে সমুদ্দুর দেখা হ'ল! অবিশ্যি সেই অনেকদিন আগে সেবার দেশের বাড়ীও শানুর ভাল লেগেছিল, খুবই ভাল লেগেছিল। কিন্তু দীঘার কাছে? কিসে, আর কিসে!

পৃথিবীতে নাকি আরও অনেক ভাল ভাল দেশ আছে, মাষ্টারমশাই গল্প করেছেন। তা'ছাড়া স্কুলের বন্ধুরাও তো কম গল্প করে না পুজোর ছুটির পর। ছুটিতে ওরা কত কত জায়গাতেই যে বেড়াতে যায়!

শানুদের পুজোর সময় কোথাও বেড়াতে যাবার উপায় নেই, শানুর মামার বাড়ীতে মা দুর্গার পুজো হয়। আর মামার বাড়ীটা

তো কলকাতাতেই। মা দুর্গাকে শানু অভক্তি করছে না, সেই ঝকঝকে চালচিত্তির-ঘেরা টানা-টানা-চোখওয়ালা মা দুর্গার মূর্ত্তিটি যখন মামাদের ঠাকুর-দালানে এসে বসেন, দেখতে দেখতে আহ্লাদে চোখে জল এসে যায় শানুর। কিন্তু মামার বাড়ীটা যে মোটেই ভাল লাগে না। কি রকম যেন নীচু নীচু ছাত, অন্ধকার অন্ধকার দালান, আর কত যে লোক! তাদের কাউকে শানু চিনতে পারে না, আর পুজোর সময় ওদের সঙ্গে মিশে চেনা লোকগুলোও যেন তালগোল পাকিয়ে যায়।

দিদিমা, বড় মামী, সেজ মামা আর ছোট মামা, যাদের নাকি শানু সত্যিকার ভালবাসে, তারা যেন এই পুজোর সময় কোথায় হারিয়ে যায়, আর বদলেও যায় যেন। শানুকে দেখেও দেখতে পায় না, কথা বললে শুনতে পায় না।

তা ছাড়া মা?

মামার বাড়ীতে গেলেই মা যেন অন্য লোক। মার এত কথা, এত হাসি, এত হৈ-চৈ, দেখে অবাক লাগে। আর খারাপ লাগে শানুর সঙ্গে ব্যাভারে। পুজোবাড়ীতে শানু যেন মার কেউ নয়, মামার বাড়ীর ওই চেনা অচেনা অনেকগুলো ছেলের মধ্যে শানুও একটা 'লোকের ছেলে'।

শানুর যদি কিছু দরকার হ'ল, মাকে বলতে গেলেই মা বলবেন, 'আঃ দেখে শুনে নাও না। বল গে না বীণা মাসীকে, আমায় জ্বালাতন করতে এসেছ কেন? দেখ দিকি আরও সব ছেলেদের! কেউ তাদের মাকে জ্বালাতন করছে?'

এই—এই সবের জন্যেই পুজোর সময়কার মামার বাড়ীটা ভাল লাগে না শানুর। মনে হয় তার থেকে স্কুলের বন্ধুদের মত ভাল ভাল দেশে বেড়াতে গেলেই অনেক ভাল হ'ত। মা দুর্গা যদি ওই পুজোর ছুটির সময়টায় না আসতেন, তা' হলে সব দিক থেকেই ভাল হ'ত।

কিন্তু এটা অন্য

অন্য ছুটির সঙ্গে রবিবার জুড়ে গিয়ে নাকি ছুটিটা লম্বা হয়ে গেছে। ঠিক জানে না শানু, মোট কথা ওই সব কথাই শুনত রোজ মা আর বাবার তর্কের মধ্যে। দু'মাস আগে থেকে যা চলছিল। কিন্তু এর নাম বড় ছুটি? লম্বা ছুটি? ছিঃ! এমন জানলে শানু কক্ষণো আসত না।.....ভাবতে ভাবতে হঠাৎ থেমে গেল শানু। আসত না? তা'হলে কী করেই বা জানতে পারত পৃথিবীতে দীঘার মত সুন্দর দেশ আছে! দেশের বাড়ী আর দীঘা, এই দু'টো জায়গা দেখল শানু, কিন্তু যেন আকাশ আর পাতাল!

দেশের বাড়ীতে তো তিনদিন মাত্র ছিল। আসবার সময় মন কেমনও খুবই করেছিল, তা বলে এখনকার মত? আজকের মত?

আশ্চর্য্য! বাবার কি মন বলে কিছু নেই? নইলে 'দেরী হয়ে যাচ্ছে, দেরী হয়ে যাচ্ছে' বলে অত লাফালাফি করছেন কেন? দু'দিন চারদিন পরে অফিসে গেলেই বা কী ক্ষতি হয়?, আসলে ওই অফিসটাই বাবার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা! কে জানে কি আছে অফিসে! কিন্তু কোন কিছুই কি দীঘার চাইতে ভাল হওয়া সম্ভব?

ওই সমুদ্দুর, ওই ঝাউবন, এই বালি আর বালি, এটা কি পৃথিবীর কোনও জায়গা? না কি স্বর্গের? আর বাতাসটা? সমুদ্দুরের ডাক মেশা কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া এই হাওয়া? বুকের মধ্যে কী রকম যেন করতে থাকে! ঝাউবনের শর-শর শন-শন শব্দটাও যেন আহ্লাদ আর দুঃখু মেশানো। এই দুঃখু দুঃখু আহ্লাদটা কী সব যেন বলে যায়, কোথা থেকে যেন ডাকে, পড়ার বই, মাষ্টার মশাই, স্কুল আর স্কুলের বন্ধুরা হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যায়, মা-বাবা মামার বাড়ীটাড়ী সব ঝাপসা হয়ে যায়। শানুর মনে হয় অনেক অনেক বছর ধরে শানু যেন এইখানেই বসে আছে এই সমুদ্দুরের ধারে বালির ঢিপির ওপর।

রামচন্দ্র তো এই সমুদ্দুর পার হয়েই সীতা উদ্ধার করেছিলেন? এই সমুদ্দুর দিয়েই তো চলে যাওয়া যায় বিলেতে আমেরিকায়, আরও সব কত কত দেশে। আর বিবেকানন্দ নাকি—

'শানু!'

পিছন থেকে মা ডেকে ওঠেন, 'কী রে! কী ছেলে তুই? সকাল থেকে দুধটুধ না খেয়েদেয়ে এই বালির গাদায় এসে বসে আছিস? বাব্বাঃ খুব সমুদ্দুর দেখাতে এনেছিলাম বটে! এই চার চারটে দিন শুধু এই ঝোড়ো হাওয়া গায়ে লাগিয়ে বালির গাদায় ঘুরলি, জানি না বাবা অসুখ-বিসুখ করবে কিনা। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি।' শানুর হাতটা ধরে টান দেন মা।

শানু অবশ্য এ টানে হেলে দোলে না, বরং এক ঝটকায় হাতটাই টেনে নিয়ে বলে, 'ছাই কলকাতা, পচা কলকাতা!'

মা হেসে ফেলে বলেন, 'তা বেশ বাবু, তোকে না হয় এখানেই শ্বশুরবাড়ী করে দেব, কেবল কেবল আসবি। এখন তো সেই ছাই কলকাতা, পচা কলকাতায় যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'না গেলে কি হয়?' শানু বিরক্ত হয়ে বলে।

এ কথায় যে এত হাসির কি আছে শানুর বুদ্ধির অগম্য। মা একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। 'না গেলে কী হয়? তাই তো! ওইটাই ঠিক বুঝতে পারছি না। এই শুনছো?'

'এই' মানে আর কেউ নয়, শানুর বাবা।

ইত্যবসরে তিনিও বাংলো থেকে বেরিয়ে লম্বা পা ফেলে এদিকে আসছেন। এই এটাও দু'চক্ষের বিষ শানুর, মার কাছে একটু যদি মনের কথা খুলে বলল, মা অমনি বাবাকে ডাক দেবেন, 'এই—এই শুনছো?'

বাবা এসেই কিন্তু শানুর মার কথায় কান না দিয়ে শানুকে বকে ওঠেন, 'কী, তোমার আর সমুদ্র দেখে আশ মিটছে না? সারাক্ষণ এই ভাবে বালির ঝড়ের মুখে পড়ে থেকে থেকে—! যা বুঝছি

গিয়ে আমাকেও অগাধ সমুদ্র দেখিয়ে ছাড়বে আর কি! এই ছেলেটির এইটি হচ্ছে মহাদোষ, যা করবে তা একেবারে বেদম!'

মা বোধ করি শানুর মুখের রাগ-অভিমান-দুঃখ-হতাশা-মেশানো ছায়াটাকে দেখতে পেলেন, তাই তাড়াতাড়ি বললেন, 'কখন আবার বেদম কি করল বাপু?'

'কখন না করছে, আর কোনটা না করছে? ভেবে দেখ। বাবু ঘুড়ি ওড়ানো শিখলেন তো এমন ঘুড়ি সুরু হ'ল যে আহার-নিদ্রা বন্ধ। জ্বরেই পড়ে গেলেন রোদে পুড়ে পুড়ে। বল খেলা ধরলেন তো—'

'না কেউ কিছু করবে না—' শানু ভারী মুখে জোর দিয়ে বলে ওঠে, 'কেউ কিছু খেলবে না, খালি তোমার মতন শুধু অফিস যাবে। পৃথিবীতে যেন অফিস ছাড়া আর কিছু নেই।'

শানুর মা এ কথায় হেসে ওঠেন, কিন্তু শানুর বাবাটি হেসে ফেলবার লোক নয়। তিনি বলে ওঠেন, 'ওই দেখছ তো? সাধে বলি ছেলেটি সবেতেই একেবারে বেদম। কথা বলছে দেখ! মাত্রাজ্ঞান বলে কিছু নেই। ওহে ছোকরা, আমি তোমার বাবা, বুঝলে? একটু মান্য করে কথা বলতে শেখ।'

'আচ্ছা বাপু শিখবে, বড় হলেই শিখবে।' বলে মা আবার হাত ধরেন, 'চল, সকাল থেকে যে একটু জল পর্য্যন্ত মুখে দিসনি!'

শানু ভেবে দেখল সত্যিই বটে, ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছে সে বাংলো বাড়ীর ওই ছোট্ট ঘর দু'খানার জেলখানা থেকে। 'খাওয়া' বলে যে জগতে একটা ব্যাপার আছে, ভুলেই গিয়েছিল। এখন টের পাচ্ছে খিদেয় পেটের মধ্যেটাও সমুদ্দুরের মত তোলপাড় করছে।

অগত্যাই গেল মায়ের সঙ্গে গুটিগুটি।

গেল, দুধ আর খাবার যা কিছু মা দিলেন, খেয়েও নিল এক নিমিষে। তারপর হাত ধুয়ে আবার যেই চলে আসছে বাইরে, বাবা ফেললেন ধরে।

'উঁহু, উঁহু, আর না। আর বাইরে না। এখন বাড়ীতে ঠাণ্ডায় বসে থাক, একটু পরেই খাওয়া-দাওয়া করে বেরোতে হবে।'

'বাঃ শেষকালে একবার বেড়াব না বুঝি?' শান্তু বলে।

'না। আর ঝড়ের হাওয়া লাগাবে না।'

বলে বাবা বাড়ীর বাইরে বেরোবার দরজাটাই বন্ধ করে দিলেন শান্তুর নাকের সামনে—যে দরজার ছিটকিনিটা হচ্ছে দরজার মাথার দিকে, শান্তুর নাগালের বাইরে।

আর এখানে টুলই বা কোথায়?

কলকাতার বাড়ীর টুলটা যদি আসার সময় লুকিয়ে নিয়ে আসত শান্তু!

লুকিয়ে!

শান্তুর মা-বাবার চোখ থেকে লুকিয়ে কিছু করা সম্ভব? আজ পর্য্যন্ত তো দেখল না শান্তু সেটা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু সম্ভব করা কি যায় না?

জানলা দিয়ে দেখতে থাকে শান্তু বাইরের খাঁ খাঁ করা বেলাভূমি। দূরে দূরে এক একটা কাঁটাঝোপ, মাঝে মাঝে বালির পাহাড়, আর ঝাউবন! কী অদ্ভুত সুন্দর ওই ঝাউবনের মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে দোলা, দুলছেই দুলছে! রাত্রে ঘুম নেই, দিনে বিশ্রাম নেই, সমুদ্রের গানের সঙ্গে তাল রেখে নেচেই চলেছে।

ওই বাঁ-দিকটায় কোনদিন যাওয়া হ'ল না।

কাল মাকেও একথা বলেছিল শান্তু। কিন্তু মা আমল দিলেন না, বললেন, 'ওদিকে কোথায় যাবি, ও দিকটা কোথায় না কোথায় চলে গেছে অজানা দিকে, গিয়ে কাজ কি বাবু! এই ডানদিকেই তো সব।'

সব মানে আর কিছুই না, এই রকম কতকগুলো ছোট ছোট বাড়ী, দু'-চারটে কিসের যেন দোকান, কিসের যেন একটা অফিস। পরশু আর একটু বেশী বেড়াতে গিয়ে কোথাকার যেন রাজার বাড়ী

দেখেছিল। উঃ ওই রাজার বাড়ী দেখেই মা-বাবা কী খুসি, কী সব কথা বলাবলি!

ভারী রাজার বাড়ী!

অমন বাড়ী যেন কখনো দেখেনি শানুরা। কলকাতায় ও রকম হাজার হাজার রাজার বাড়ী আছে। কিন্তু কে দেখতে চায় রাজার বাড়ী?

শানু অন্তত না।

না, শানু নয়, শানুর মতন কল্পনায় মন ভাসানো ছেলেরা নয়।

রাজপুত্রেরা চিরদিনই তেপান্তরের মাঠের হাতছানিতে ছোটে।

মাকে বলেছিল শানু, 'ডান দিকে কী ছাই সব! ওই বাঁ-দিকটায় কত ঝাউবন!'

'সেই জন্যেই তো ভয় রে বাপু! কিসের মধ্যে কি থাকে, কোন জন্তু-জানোয়ার আছে কি না—'

'আস্তে আস্তে উঁকি দিতে দিতে চল না? জন্তু টন্তু দেখতে পেলে পালিয়ে আসব।'

মাকে অনেক খোসামোদ করেছিল শানু। আর মা বলেছিলেন, 'না রে শানু, অজানার দিকে গিয়ে কাজ নেই।'

অজানার দিকে গিয়ে কাজ নেই, তবে কি যত কাজ জানা কথায় আর জানা জায়গায়? তা' হলে এত সব যারা আবিষ্কার করল? কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন, তেনজিং হিমালয়ের চূড়ো, সব কি জানা জায়গায় বসে থেকে থেকে?

জানলা থেকে উঠে এল শানু।

দেখল বাবা নিবিষ্টমনে দাড়ি কামাচ্ছেন। যাক কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্দি। শানুর বাবার জীবনে ওই একটি মাত্র সখ, আরাম করে বসে একঘণ্টা ধরে দাড়ি কামানো!

তার কত রকম সরঞ্জাম!

কামানো হয়ে গেলে একটা ফটকিরি না কি, তার চাক্তি গালে ঘসতে থাকবেন আস্তে আস্তে বুলিয়ে বুলিয়ে, তারপর পাউডার ঘসা চলতে থাকবে। এতক্ষণ দাড়ি আর মুখ নিয়ে বসে থাকা দেখলে শানুর বিচ্ছিরি লাগে, কিন্তু আজ খুব ভাল লাগল। আজ এক কৌটো পাউডার নিয়ে গালে ঘসুন বাবা।

মায়ের সন্ধান করতে এদিকে এল—এই ছোট্ট বাড়ীর ছোট্ট রান্নাঘরটায়। উঠোন থেকে চার-পাঁচটা সিঁড়ি উঠে উঁচু মতন দাওয়ার উপর রান্নাঘর।

মা শানুর মুখটা দেখে ফেলে এ ইচ্ছে ছিল না শানুর, কিন্তু মুখ নীচু করে রাঁধতে রাঁধতেও কেমন করেই যে শানুর ওই একটু উঁকি মারাটা দেখে ফেললেন।

বললেন, 'কিরে শানু ?'

অগত্যাই শানুকে বলতে হ'ল 'জল খাব।' নইলে শানু জানে, 'না, কিছু না' বললেই মা সন্দেহে আকুল হয়ে উঠবেন, আর 'কিছু না' মানে কি, এই প্রশ্ন করে শানুকে অস্থির করে তুলবেন। তার থেকে এই ভাল।

'জল খাব।'

সঙ্গে সঙ্গে মা বলে ওঠেন, 'এখানে এসে এত জল খাওয়া বেড়েছে তোর !'

শানু জানে বলবেই।

ছোটরা যা কিছু করতে চাইবে, বড়রা তা নিয়ে কিছু বলবেই। এত কথাও কইতে ভালবাসে বড়রা ! কথা কথা খালি কথা। বালির মাঠে বেড়াতে গেছ, সমুদ্দুরের শব্দ শুনছ, চুপচাপ তাই শোনো, তা নয়, বাবাতে আর মা-তে সারা রাস্তা চলবে খালি গল্প আর গল্প।

আর তাই কি ভাল গল্প ?

সেই পচা কলকাতার পচা লোকদের গল্প।

কাল সারা বিকেল তো মা ওদের কলকাতার পাশের বাড়ীর গিন্নী কত রাগী তার গল্প করলেন বাবার সঙ্গে সমুদ্দুরের ধারে বসে বসে। আর বললেন কি না—বাব্বাঃ এত শুনি দীঘা দীঘা! এমন জানলে কে আসত! তিনদিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। কিছু নেই, শুধু বালি আর বালি।

শুনে শানু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

শানুর মা যদি শানুর মত হতেন!

জল দিয়ে মা বললেন, 'কোথায় ছিলি? বোস এখানে, বোস আমার কাছে।'

'না, আমি জানলায় বসব।' বলে শানু চলে এল।

মায়ের কাছে এই মিথ্যে কথাটুকু বলতে অবশ্য শানু মনে মনে একবার ঠাকুরকে নমস্কার করে নিয়েছে, যেমন অনেক সময়ই করে।

জল খেয়ে রান্নাঘর থেকে নেমে এল শানু উঠোনের পাশের দিকে।

কেন এল?

শানু জানে এই দিকে একটা ছোট্ট দরজা আছে। এই দরজা দিয়ে ওদের যে ঝিটা দু'তিন দিন বাসন মাজল, সে আসে।

এই ছোট্ট দরজার খিল শানুর নাগালের মধ্যে। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়ল শানু। বুকটা ভয়ঙ্কর ঢিপ-ঢিপ করছে, পা-টা কাঁপছে যেন।

লুকিয়ে শুধু একটু বাড়ী থেকে বেরোলেই এত ভয় করে? যাক গে করুক গে ভয়, বাঁ-দিকের ওই ঝাউবনের ওপারের রহস্য ভেদ করতেই হবে তাকে। মার রান্না শেষ হতে এখনো দেরা আছে, দেখে এসেছে শানু। শুধু ভাত রান্না হচ্ছে, আর সব কত কি কুটনো ফুটনো পড়ে।

আর বাবার তো কথাই নেই। কামানো শেষ হতে অনেক দেরী।

এর মধ্যে ঘুরে আসতে পারবে শান্তু। বড় গলায় বলতে পারবে মাকে—বাঁ-দিকটা কেমন মজা করে দেখে এলাম আমি। তুমি তো খালি বোকার মত রাঁধলে বসে বসে।

আস্তে আস্তে এগোতে থাকে শান্তু ভয় ভয় উত্তেজনা নিয়ে।

দুই

অন্য দিন শান্তুর মা চটপট রান্না সেরে ফেলেন, তাড়া লাগান, 'শান্তু, আয় চান করে নে শান্তু, বেলা হয়ে গেল রে—' আজ কিন্তু অত চটপট হল না শান্তুর মার। কারণ? কারণ আজই এখানের 'শেষদিন' বলে শান্তুর বাবা জেলেদের কাছ থেকে দেদার মাছ কিনে ফেলেছেন।

দেদার খেতে যে কেন এত ভাল লাগে মানুষের, সেটা অবশ্য শান্তুর বুদ্ধির অগম্য। শান্তুর তো বেশী বেশী খাবার জিনিস দেখলেই ভয় করে। কিন্তু শান্তুর বাবার ওতেই পরম আনন্দ। বরাবর তো শান্তু তাই দেখে এল। আর জিনিস সস্তা হলে? সে তো বলতে গেলে ফুরোবে না।

বাজারে আম সস্তা হয়েছে, শান্তুর বাবা মুটের মাথায় চাপিয়ে এক ঝাঁকাই আম এনে হাজির করলেন। বাজারে ছানা সস্তা

হয়েছে, এসে গেল শান্তুদের বাড়ীতে তাল তাল ছানা। আর শান্তুর বাবার পকেটের টাকা যেদিন সস্তা হয়?

সেদিন তো আর কথাই নেই। মাছ মাংস রাবড়ী রাজভোগ—কী নয়? বন্ধুদের নেমন্তন্ন খাইয়ে, তবে সে সব ফুরনো যায়। কিন্তু মজাটি এই, জগতের যে দুটি সেরা খাদ্য, আইসক্রীম আর চকোলেট শান্তুর বাবা তার দিক দিয়েও যাবেন না। বরং আইসক্রীম-চকোলেট, খেতে দেখলেই বকাবকি। অথচ যদি একদিন মুটের মাথায় চাপিয়ে চকোলেট নিয়ে আসতেন? শান্তু হয়তো তার বাবাকে পুজোই করতে সুরু করত তার পর থেকে।

তা পুজো পাবার ইচ্ছে বিশেষ দেখা যায় না শান্তুর বাবার। ওই মাছ আর আম, ছানা আর ছানার জিলিপি, এই সবেই মন ওঁর।

কাজে কাজেই শান্তুর মাকেও সেই সবে মন দিতে হয়। তা মন দিয়েই রাঁধলেন শান্তুর মা অনেক বেলা অবধি, মাছের সাত রকম। তারপর ডাক দিলেন, 'শান্তু, শান্তুরে, এইবার চান করবি আয়।'

বুঝতেই পারছো, ডাকে সাড়া পেলেন না। কাজেই রান্নাঘর থেকে নেমে এলেন শান্তুর মা। চেঁচিয়ে বললেন, 'কী রে শান্তু, কানে তুলো দিয়ে বসে আছিস নাকি? কত বেলা হয়ে গেল, আয়! নাইবি খাবি না?'

সমুদ্রের শব্দে আর ঝড়ের চাপা গোঁ-গোঁ শব্দে ডাকটা অবশ্য হাল্‌কা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, তবু শান্তুর বাবা উঠোনের ওপারের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'শান্তু তো ওদিকেই আছে, ডাকাডাকি করছো কেন?'

শান্তুর মা ব্যস্ত হয়ে চলে এলেন, বললেন, 'সে কী, এখানে তো নেই! আমি ভাবছি তোমার কাছে।'

'আমার কাছে বসে থাকবারই ছেলে তোমার!' বললেন শান্তুর বাবা।

'তাহলে নির্ঘাৎ আবার বেরিয়ে গেছে, এই দুপুর রোদ্দুরে।'

কিন্তু বেরিয়ে যাবে কোথা দিয়ে ?

শানুর বাবা তো দরজা বন্ধ করে রেখেছেন ! আর সে দরজার ছিটকিনি যেমন বন্ধ তেমনিই রয়েছে।

'পাখী তো নয়, যে জানলা দিয়ে উড়ে যাবে !' বললেন শানুর বাবা।

তা যাবে না সত্যি, কিন্তু গেলই বা কোথায়, আর কী করেই বা ! সাতমহলা রাজপুরী নয় যে খোঁজবার অনেক জায়গা আছে, একই ঘরে সাতবার ঘোরাঘুরি করে শানুর মা উদ্‌ভ্রান্তের মত উঠোনের ধারে নেমে পড়েন আর কাঁদো-কাঁদো গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এই যে খিড়কির দরজা খোলা !'

'খিড়কির দরজা খোলা ! খিড়কি বলে আরও একটা দরজা আছে নাকি ?' শানুর বাবা ছুটে গিয়ে দেখে রেগে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ওঃ এইখান দিয়েই তাহলে বেরিয়ে যাওয়া হয়েছে বাবুর ! দেখ— দেখ তোমার ছেলের আসপদ্দা ! আমি বারণ করেছি লুকিয়ে পিছন দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছে। উঃ এই প্রচণ্ড রোদ্দুর ! ভোগাবে, বেশ বুঝছি ও আমাকে দস্তুরমত ভোগাবে। কলকাতায় গিয়ে স্রেফ 'ডাক্তার বাড়ী আর ঘর' করতে হবে আমায়। সাধে বলেছিলাম দেশের বাড়ীই ভাল ! তা তো পছন্দ হল না তোমার। কী সখ, না 'ছেলেকে সমুদ্র দেখাবো'। দেখিয়েছো তো সমুদ্র ছেলেকে ? এইবার ছেলেই আমাদের সমুদ্র দেখাবে !'

কিন্তু এত কথা দাঁড়িয়ে শুনছে কে ?

শানুর মা তো তখন বেরিয়ে পড়েছেন। আর চোখে হাত ঢাকা দিয়ে রোদ আড়াল করে জোর চীৎকার করে ডাকছেন, 'শানু, শানু, শানুরে !'

কিন্তু কোথায় শানু ?

এবারে ভয় পেয়ে শানুর বাবাও বেরিয়ে পড়েন, আর সেই ধূ ধূ বালির মাঝখানে ঘোরাঘুরি করেন আর ডাক দেন, 'শানু, শানু !'

সে ডাকাডাকির উত্তর মেলে না।

শানু নেই।

'নিশ্চয় ওই দোকানটায় গিয়ে জমিয়ে বসেছে' শানুর বাবা বলে ওঠেন, 'যেখান থেকে সেদিন দেশলাই কিনলাম আমরা। মহা আড্ডাবাজ ছেলে তো! যার সঙ্গে দেখা হবে, তার সঙ্গেই জমিয়ে বসবে! উঃ এত জ্বালাতেও পারে! যাও তুমি বাড়ীর মধ্যে যাও, আমি দেখছি—'

বলে সেই ডানদিকে এগোতে থাকেন তিনি। যেদিকে 'সব' আছে।

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে কে যাচ্ছে?

শানুর মা?

ছেলেকে খুঁজে না পেলে মা কখনো পারে বাড়ীর মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে? আর শানুর মার নিশ্চিত ধারণা হতে থাকে, ডানদিকে যায় নি শানু—গেছে সেই বাঁ-দিকে। যে দিকটা ওকে অবিরত টানত।

কিন্তু এই দুপুর রোদে কতদূর যেতে পারে ওইটুকু ছোট্ট ছেলে!

শানুর মা সেই বালির চড়ায় পাগলের মত ঘুরে বেড়ান, আর সমুদ্রের শব্দ ছাপিয়ে চেঁচান, 'শানু, শানুরে! শানু!'

সে শব্দকে আবার চাপা দিয়ে ফেলে সমুদ্র। যেন একটা চাপা আর্তনাদের মত আওয়াজ করতে থাকে 'গোঁ গোঁ গোঁ'!

'ওই যে! ওই যে বসে রয়েছে।'

বালির গাদায় ছুটতে গিয়ে আছাড় খেতে খেতেও দৌড়তে থাকেন শানুর মা। অনেক দূরে সমুদ্রের একেবারে কোণ ঘেঁসে বসে আছে দুষ্টুটা ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে।

শানুর মার চুলের রাশি বালিতে ভরে ওঠে, শাড়ীর আঁচল বাতাসের ঝাপটে গা থেকে উড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। ধুলোর ঝড়ে

চোখ অন্ধ হয়ে ওঠে শান্তুর মার, তবু ছুটতে থাকেন। সমুদ্রের অত কাছে কি বলে বসে আছে হতভাগা ছেলেটা !

'না দোকানে নেই। যায় নি! ওদিকেই যায় নি!' বলতে বলতে ওদিক থেকে ঘুরে এসে শান্তুর বাবা অবাক হয়ে দেখেন শান্তুর মা ছুটছেন। আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন আবার ছুটছেন।

'কি হ'ল ওদিকে ?'

এ কথার উত্তর কেউ দিল না।

অগত্যা শান্তুর বাবাও ছুটতে থাকেন। কিন্তু বুঝতে পারেন না কেন ওদিকে যাচ্ছেন শান্তুর মা। ছুটতে ছুটতে কাছাকাছি এসে যান, হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'এদিকে কি ?'

'ওই যেঃ! বঃসে রহহেছে'—বাতাসে উড়ে যাওয়া কথা থেকে এইটুকু বুঝতে পারা যায়।

'কোথায় কোথায় ?'

'ওই তো!'

সমুদ্রের দিকে মুখ করে হতাশ দৃষ্টি ফেলেন শান্তুর বাবা, 'কই ?'

'দেখতে পাচ্ছ না ?' রেগে ওঠেন শান্তুর মা। 'সর্বনেশে দুষ্টুটা একেবারে পাড়ে গিয়ে বসেছে, যদি ঢেউ এসে নিয়ে চলে যায়!' একটু দাঁড়িয়ে পড়েন শান্তুর মা, 'ওকে কিন্তু তুমি বকতে পারবে না। বড্ড তুমি বক ওকে। এখন ওর নাওয়া খাওয়ার সময়—'

'আচ্ছা বাবু বকব না। তোমার ওই আহ্লাদে গোপাল এলে রাজভোগ খাইও তুমি। কিন্তু কোথায় তুমি দেখছ ওকে ? আমি তো খালি কাঁটাগাছের ঝোপ দেখতে পাচ্ছি!'

কিন্তু শান্তুর মাও কি শেষ পর্যন্ত তা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন ? কাঁটা ঝোপ ছাড়া ? সমুদ্রের ধারে এখানে সেখানে ছোট ছোট কাঁটাগাছের ঝাড় দূরে থেকে দেখাচ্ছে ঠিক ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে

বসে থাকা একটা মানুষ। যেন সে মানুষটা রোদ গ্রীষ্ম সহ্য করে নিথর বসে থেকে সমুদ্রের ঢেউ গুনছে!

শানু ভাবা সেই কাঁটাগাছটার কাছে গিয়ে ভুল ভাঙ্গতেই শানুর মা হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠেন, 'নিশ্চয় সমুদ্রে ডুবে গেছে শানু!'

'কী আশ্চর্য, ওরকম করছ কেন?' শানুর বাবা নিজে কাতর হয়েও ধমকে ওঠেন, বালি রাস্তা হল চোরা রাস্তা, কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলে, সোজা চলছি মনে করে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতে হয় সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। একলা পথে বেরিয়ে দিকহারা হয়েছে মনে হচ্ছে, ওই ওদিকটা দেখি! কিন্তু এতক্ষণে বাড়ী ফেরে নি তো?'

কিন্তু এত কথা শানুর মার মাথায় ঢোকে না, তিনি সেই কাঁটা-ঝোপের কাছটায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকেন, 'ওরে শানু, আমি কেন মরতে দীঘায় এসেছিলাম!'

দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে পড়ে, শানুর মা-বাবার মুখ-চোখ বসে কালো হয়ে ওঠে, ওঁরাও দিকহারার মত ঘুরে বেড়ান, বুঝতে পারছেন না কোনদিকে যাচ্ছেন। শুধু ডেকে বেড়াচ্ছেন, 'ও শানু শানুমণি, আমরা তোকে আর বকব না বাবা। তুই চলে আয়।'

ক্রমশঃ হতাশ হন।

বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে। তবে কি সত্যিই শানুর মা যা বলেছিলেন, তাই? লোণা জলের একটা বড় ঝাপট এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মিষ্টি ছোট্ট ছেলেটাকে?

কিন্তু সন্দেহ হলেই কি বিশ্বাস করা যায়? না, বিশ্বাস করে বসে বসে কাঁদা যায়? কান্নাকাটি করতে করতেই ছুটোছুটি করতে হয় শানুর বাবাকে। ছেলে হারিয়ে গেলে যা যা করতে হয় তাই করেন রাত্তির অবধি।

তা এ তো আর কলকাতা নয় যে, ঝপাঝপ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন, হাসপাতালে হাসপাতালে ফোন করবেন,

আত্মীয়-বন্ধু যে যেখানে আছে সব্বাইর বাড়ী খোঁজ করে বেড়াবেন, আর মোটরগাড়ী চড়ে দিগ্বিদিক চষবেন !

এখানে না আছে মোটরগাড়ী, না আছে এত এত হাসপাতাল, না আছে কোনও চেনা-জানা বাড়ী, আর খবরের কাগজের অফিসের কথা তো বাদই দাও।

শুধু টিম-টিম করছে একটা পোষ্ট অফিস, সেখানে গিয়ে টেলিগ্রাম করে এলেন শানুর বাবা, শানুর মামার বাড়ী আর চেনা-জানাদের বাড়ী ঃ

'শানুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

স্টেশনারি দোকানের দোকানীটা বলল, দেখুন, 'কেউ ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে কিনা। জগতে তো বদলোকের অভাব নেই। ওই দূরের দিকে জেলেবস্তীতে খোঁজ করুন গিয়ে কাল সকালে।

'কাল সকালে কেন?' শানুর মা জোরে বলে ওঠেন, 'আজ এক্ষুণি যাব। কোথায় সেই জেলেবস্তী, দেখিয়ে দাও আমাদের—'

লোকটা একটু দুঃখের হাসি হাসল।

'এখন কোথায় যাবেন? দেখছেন তো অন্ধকারের অবস্থা! খুঁজেও পাবেন না, তা ছাড়া রাত দুপুরে তাদের ঘরে হানা দিয়ে হেলে খুঁজতে গেলে, জেলেরা খুন করে দেবে। এরা এমনিতে নিরীহ, কিন্তু যদি মনে ভয় ঢোকে, আর সন্দেহ আসে অকারণ ওদের উত্যক্ত করা হচ্ছে, তাহলে ক্ষেপে যায়। কাল সকালে যাবেন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে।'

'এখানে পুলিশ কোথায় পাব?' হতাশ হাহাকার করে ওঠেন শানুর বাবা।

'পাবেন, ফাঁড়িতে পুলিশ আছে।' দোকানীটা বিষণ্ণভাবে বলে,

'দেখুন দিকি কী মুস্কিল! আজই চলে যাবার কথা ছিল বলছেন, আর আজই কিনা—'

বাড়ীর বাড়ীওলাও ওই কথা বললেন।

বাড়ীওলা নয় অবিশ্যি, সরকারি বাংলোর ম্যানেজার।

চারদিনের জন্যে বাড়ী বুক করেছিলেন শানুর বাবা, এই খবর জানিয়ে বলতে গেলেন, 'যে ক'দিন না ছেলের সন্ধান পাচ্ছি, এ জায়গাটাকে তো ছেড়ে যেতে পারছি না। কাজেই আরও কয়েকদিন বাড়ীটা—'

ভদ্রলোক বলে ওঠেন, 'বিলক্ষণ নিশ্চয়, এ আর বলতে! ছেলে হারানো বলে কথা। তা আপনি একটা দরখাস্ত করে দিন। তবে কিনা হারানো ছেলে পাওয়া বড় শক্ত মশাই! ও আপনার মিথ্যে আশা। এই যে কাগজে এত নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দেখেন, শুনেছেন কখনো তাদের কেউ ফিরে এসেছে? আসে না। আমি তো মশাই কাগজের ওই পৃষ্ঠাটাই তন্ন তন্ন করে পড়ি। অবিশ্যি আরও সবই পড়ি। কাগজ পড়া আমার নেশা। তা কই মশাই, আজ পর্যন্ত তো কখনো দেখলাম না নিরুদ্দিষ্টের প্রত্যাবর্তন। কাজেই বুঝছেন কিনা—'

'চুপ করুন। এসব অপয়া কথা বলছেন কেন?' চেঁচিয়ে ওঠেন শানুর মা।

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বলেন, 'অন্যায়টা কি বললাম মা লক্ষ্মী, অন্যায়টা কি বললাম?'

তা' ভদ্রলোক বলেছেন ঠিকই। অন্যায় আর কি করেছেন তিনি? অপয়া কথা বলতে বারণ করলেও শানুর মা-বাবা তো সেই অপয়া কথাই ভাবছেন বসে বসে।

ভাবছেন আর ফিরে পাব না শানুকে।

কলকাতা শহর নয় যে, আশা থাকবে কোথায় না কোথায় হয়তো আছে। কলকাতার হাজার হাজার বাড়ী, হাজার হাজার রাস্তা,

লক্ষ লক্ষ দোকানপসার, গলিঘুঁজি, আর দলে দলে বদলোকের মাঝখানে একটা ছোট ছেলে আটকে যাওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু এখানে এই ছোট্ট দেশটুকুর মধ্যে ?

যেখানে বাড়ীর সংখ্যা আঙুলে গুণে শেষ করা যায়, মানুষ চোখে দেখাই যায় না, পথঘাট গলিঘুঁজি বলতে কিছুই নেই, সেখানে আর আশা করবার কি আছে ?

সকালবেলার সেই সাত রকম মাছরান্না পড়ে পড়ে শুকোয়, আধবাঁধা বিছানা আর আধ-গোছানো বাক্স-সুটকেস ডাঁই করে পড়ে থাকে, শানুর মা-বাবার মুখে একটু জলও পড়ে না। তাঁরা শুধু মাটিতে শুয়ে পড়ে পড়ে ভাবতে থাকেন, খিড়কি বলে আর একটা দরজা আছে সেটা কেন আগে দেখি নি! ভাবতে থাকেন দীঘায় বেড়াতে আসার সখ না করে ছুটিটা কলকাতাতেই কেন থাকি নি!

আর শানু ?

সে কি সত্যিই সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গেছে ? নাকি কোন ছেলেচোরের খর্পরে পড়েছে ? আর নাকি এখনো ধূ ধূ বালির চড়ায় পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ?

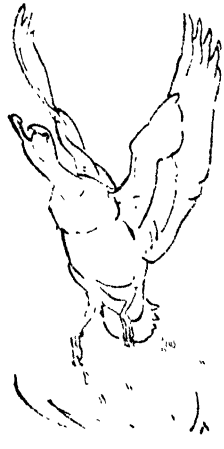

তিন

ছুট! ছুট! ছুট!

বালির গাদায় দৌড়ান সহজ নয়। তবু প্রাণপণে ছুটতে থাকে শানু বালির গাদায় পা ডুবিয়ে আর বালির গর্ত থেকে পা টেনে তুলে তুলে। মুখটা ওর লাল হয়ে ওঠে, বুকটা ওঠা-পড়া করতে থাকে। কেউ যদি তখন শানুকে দেখত, নির্ঘাৎ ভাবত শানুর পিছনে গুণ্ডা, পুলিশ কিংবা পাগলা কুকুর তেড়ে আসছে।

আসলে কিন্তু শানুর মনের পিছনে তাড়া করে আসছিল বাবার ভয়। বাবা যদি হঠাৎ বাড়ীর পিছনের সেই ছোট্ট দরজায় এসে দাঁড়ান, আর দেখেন শানু তাঁর বারণ-টারণ না শুনে দুপুর রোদ্দুরে বাইরে বেরিয়েছে, তা হলে কী হতে পারে শানুও বলতে পারবে না। কাজেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বাড়ীর কাছ থেকে মিলিয়ে যাওয়া।

অনেকক্ষণ ছুটে পা যখন আর কিছুতেই চলল না, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল, তখন একবার সাহস করে পিছন ফিরে তাকাল শানু। তাকিয়ে ওদের বাড়ী, কি বাড়ীর সেই পিছনের দরজাটার চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বসে পড়ল।

বসে পড়ল একটা ঝাউগাছের নীচে বালির ওপর পা ছড়িয়ে। এখানটা বোধহয় সমুদ্রের ধার থেকে নীচু জমি, তাই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না—শুধু তার সেই চির অশ্রান্ত অশান্ত কলরোল কানে এসে বাজছে। আর সে শব্দ শানুকে যেন সব কিছু ভুলিয়ে হাজার হাজার বছর পার করে নিয়ে যাচ্ছে দূর অতীতে।

রামচন্দ্র তীরধনুক নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সমুদ্রকে শাসন করবেন বলে, সমুদ্রদেবতা জল থেকে উঠে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে কাতর প্রার্থনা করছেন, বেঁধো না—আমাকে বেঁধো না।

রামচন্দ্র বাণ সংবরণ করলেন। দলে দলে বানর সেনা পাথরের চাঁই হাতে করে এনে ফেলতে লাগল সমুদ্রের জলে। শিলা ভাসতে থাকল রামচন্দ্রের মহিমায়। তারপর এল কাঠবেড়ালি, সেও যোগ দিল সমুদ্রবন্ধনে।

আর তারপর ?

পায়ে হেঁটে রামচন্দ্র চললেন লঙ্কায়।

ব্যাকুল শানু ভাবতে থাকে একালে কেন রামচন্দ্রের মতন ভয়ানক বীরেরা থাকেন না—যাঁরা ইচ্ছে করলেই সমুদ্র বন্ধন করতে পারেন। রাক্ষস মেরে সীতা উদ্ধার করতে পারেন। পারেন মেঘের আড়ালে থাকা ইন্দ্রজিৎকে বাণ মারতে।

শানু মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'ছাই! একালে বীর বলে কিছু নেই।'

নিজের কথাটা নিজের কানে যেতেই হঠাৎ কেমন অস্বস্তি হল শানুর। একা একা কথা বলা অবশ্য ওর খুবই অভ্যাস, খেলতে খেলতে কি গল্পের বই পড়তে পড়তে মনের কথা মুখে বলে ওঠে ও। কিন্তু সে তো এমন তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে নয়। এখানে সমুদ্রের শব্দ আর ঝাউবনের শব্দের মাঝখানে নিজের গলার শব্দে গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল।

তবু ভাবতে থাকতে লাগল শানু—একালের যুদ্ধু-টুদ্ধু সব ফক্কিকারী। আকাশ থেকে বোমা ফেলায় আবার বীরত্ব কি? রাক্ষসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাণ মেরে তাকে নাস্তানাবুদ করে ফেলার মত বীরত্ব নাকি সেটা?

একাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে উঠে পড়ল শানু। আর সেই কেমন একরকম ভয়-ভয় আর গা ছম্‌-ছমানি নিয়ে এগোতে থাকল কোনও

একটা দিক ধরে। 'বাঁ দিক' নামক সেই অজানা দিকটা যেন হঠাৎ কি রকম গোলমাল হয়ে গেছে।

ঝাউবনের পিছন দিকটাই কি সেই বাঁ দিক?

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না, ওই ধূ ধূ বালির মাঠ পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে সত্যিই একটা অজানা দেশ আছে। পৃথিবীর সব লোকেরা এখনো আবিষ্কার করেনি সেই দেশ। জানে না, তাই কেউ যায়ও না ওদিকে।

কিন্তু শানু হাঁটতে হাঁটতে সেইখানে গিয়ে পড়বে। আর অদ্ভুত-পোষাক-পরা অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক শানুকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াবে। আর শানু—

গল্পের বইতে ঠিক ওই রকম জায়গায় গল্পের ছেলেরা কী করে ভেবে নিল শানু। কি আর করে, হাত-মুখ নেড়ে ইসারায় তাদের সঙ্গে কথা চালায়। শানুও তাই করবে। তারপর তারা শানুর সঙ্গে গল্প করবে। শানু যা চায় দেবে।

আচ্ছা কী-ই বা ওদের আছে?

হয়তো পাখীর পালক, নয় তো জন্তুর ছাল, কি সমুদ্রের কড়ি-ঝিনুক। আর কী থাকা সম্ভব?

কিন্তু ওরা যে স্রেফ অসভ্য বুনো। মাথায় পাখীর পালক গোঁজে আর কোমরে হরিণের চামড়া জড়ায়, একথা কে বলল শানুকে? শানু ভাবে, এমনও তো হতে পারে বিরাট এক ঐশ্বর্যশালী রাজার রাজত্ব আছে ওখানে। শানু গিয়ে হকচকিয়ে যাবে।

শানু গিয়ে দেখবে সেখানে লোকেরা সবাই হীরে-বসানো সোনার জামা পরে, মুক্তো-বসানো রূপোর জুতো পায়ে দেয়, চুনি পান্না না কি—সেই সব পুঁতে পুঁতে বাড়ীর দেওয়ালের বাহার করে।

কে জানে বা সেই দ্বাপর যুগের যুধিষ্ঠিরের স্ফটিক প্রাসাদের মত প্রাসাদ আছে কি না ওখানে!

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে পাবে শানু

রোদে ঝলমলে সেই স্ফটিক প্রাসাদের মাথায় সোনার চূড়ো ঝকমকাচ্ছে। সেই প্রাসাদের দারোয়ান প্রহরীরা পর্যন্ত ঝকমকে ঝলমলে।

আর সেখানের রাজা?

সে তো শানু ভাবতেই পারছে না কত সুন্দর! একালে নাকি রাজা নেই! শানুর ছোট মামা একদিন বলেছিলেন, 'রাজা নেই, রাজা থাকতেও নেই। অনেক প্রজার ওপর একজন রাজা হয়ে বসে রাজত্ব করা অন্যায়।'

কথাটা শানুর ভাল লাগে নি।

রাজা হওয়াই যদি অন্যায়, তাহলে রাজ্যটা চালাবে কে? আর চকচকে ঝকঝকে ঝলমলে সুন্দর মুকুট টুকুট পরবে কে? পৃথিবীসুদ্ধু মানুষ সবাই শার্ট কোট ধুতি পাজামা এই সব পরে ঘুরে বেড়াবে? পায়রার ডিমের মত বড় বড় মুক্তোর মালাই বা তবে কাদের জন্যে তৈরী হবে, যদি রাণী আর রাজকুমারী থাকবে না?

তা কিছুই যদি থাকবে না, তাহলে কাদের নিয়ে গল্প তৈরী হবে? আর বীরত্বই বা দেখাবে কারা?

নাঃ ছোট মামার সেই কথাটা মোটেই ভাল লাগে নি শানুর। তাই শানু কল্পনা করতে থাকে, ছোট মামার চোখের আড়ালে রাজপ্রাসাদ, রাজা-রাণী, রাজকন্যা সবই আছে। ছোট মামা জীবনে কখনো দীঘায় আসেন নি বলেই, আর দেখেন নি বলেই—

আচ্ছা, ওই প্রাসাদের রাজা হঠাৎ শানুর মত ছোট্ট একটি অন্য রাজ্যের ছেলেকে দেখে কি রেগে মারতে আসবেন, না ভালবাসবেন?

শানুর তো নিশ্চিত বিশ্বাস হচ্ছে—ভালই বাসবেন। বাসবেন না কেন, ওই অনাবিষ্কৃত দেশের রাজার মেজাজটা তো খুবই ভাল হওয়া উচিত। তাঁকে তো পৃথিবীর সেরা বিচ্ছিরী জায়গা কলকাতায় থাকতে হয় না!

না, না। রাজা বা তেমনি বড়সড় জমকালো কারো চোখে যদি

পড়ে যায় শান্তু, তিনি শান্তুকে আদর করে বলবেন, 'বল তোমার কী চাই? যা চাইবে তাই পাবে।'

বলে ধনভাণ্ডার খুলে ধরবেন শান্তুর সামনে। কিন্তু যদি—হঠাৎ একটা কথা ভেবে বেজায় রকম ভাবনায় পড়ে যায় শান্তু।

হাঁটতে হাঁটতে থেমে যায় শান্তু। ঠোঁটটা চেটে নেয়। একটু হাঁপায়! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে একবার, তাকিয়ে দেখে সামনের দিকে। তারপর ভাবে যদি সেই রাজামশাই বলেন, 'তোমাকে কিন্তু কেবলমাত্তর একটা জিনিস দেওয়া হবে—মাত্তর একটা। সে তুমি যা চাও। এক ঘড়া মোহর, এক তাল সোনা, এক থলে হীরে-মুক্তো, কি এক থালা—'

সে সব কথা কি কান দিয়ে শুনবে শান্তু? ওই সব হীরে-মুক্তো সোনার কথা? না, শুনবে না। শান্তু চাইবে শুধু এক গেলাস জল —ঠাণ্ডা কন্‌কনে বড় এক গেলাস জল!

হ্যাঁ, এখন আর ওর থেকে ভালো কোনও জিনিসের কথা মনে আসছে না শান্তুর। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সেরা জিনিস হচ্ছে জল।

আচ্ছা বাড়ী থেকে বেরোবার আগে মার কাছে জল চেয়েছিল শান্তু? বলেছিল না, জল খাব?

খেয়েছিল কি?

মনে করতে পারল না।

শুধু মার রান্নাঘরের সেই জল-টইটুম্বুর বালতিটার কথা মনে মনে পড়তে লাগল তার।

তবে কি সেই বালতির দিকেই ফিরে যাবে শান্তু? আর হাঁটবে না? সন্ধান করে দেখবে না কী আছে আরো অনেক—অনেক দূরে?

তা হলে তো শান্তু ভীরু কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই হবে না। একটু তেষ্টা পেলেই যে কাতর হয়ে সঙ্কল্পচ্যুত হয় তাকে কি কেউ মানুষ বলবে? ভয়ানক ভয়ানক বীরেরা যখন মরুভূমি পার হয়,

যখন উটের গলার জলটিও ফুরিয়ে যায়—তা ছাড়া রণক্ষেত্রে জলের অভাবে সৈনিকদের কি হয় ?

আর আবিষ্কারকদের তো শুধুই কষ্ট—শুধুই কষ্ট।

কত ডাকাতদের হাতে পড়তে হয় তাদের, কত বাঘের মুখে।

কুমীরের কামড়ও খেতে হয় কত সময়। তা ছাড়া খেতে না পাওয়া, জল না পাওয়া, এ সব তো নিয়ম।

কিন্তু—

ভাবল শানু, তেষ্টার সময় জল না পাওয়ার মতন কষ্ট বোধহয় কুমীরের কামড়েও নয়। এখন যদি ভগবান রাখাল বালকের বেশ ধরে এক কুঁজো জল নিয়ে আসতেন !

ক্রমশঃ আর জলের গেলাসের কথা ভাবছে না শানু, কুঁজোর কথাই ভাবছে।

আর শুধুই কি কুঁজোর কথা ?

মামার বাড়ীর দালানের কোণটায় বসে থাকা বিরাট সেই পেটমোটা জালাটার কথা ভাবছে না ? যে জালাটা শানু জন্মানোর আগে থেকে সেখানে আছে। উঃ জালাটার গা-টাই কী ঠাণ্ডা ! গায়ে হাত বুলোলে খানিকটা তেষ্টা ভাঙে !

কিন্তু তেমন বেশী করে জল তো কোনদিন খায় নি শানু।

ইস্ কী বোকামীই না হয়ে গেছে !

সেই একজালা জল যদি শানু সবটা খেয়ে রাখত, তা হলে হয়তো এখন এত তেষ্টা পেত না। পেটের ভেতরটা বেশ জলো জলো হয়ে থাকত।

গলার ভেতর থেকে জিভ ঠোঁট সব কিছু শুকিয়ে উঠে যেন পেটের ভেতর দিকে টানছে। এতক্ষণ ঢোক গিলে গিলে মুখটা ভেজা রাখছিল, তাও আর হচ্ছে না। গায়ের মধ্যে কী রকম যেন বমিভাব আসছে।

ক্রমশঃ শানু আর মামার বাড়ীর জালাটার কথাও ভাবছে না,

ভাবছে দেশের বাড়ীর সেই প্রকাণ্ড ইঁদারাটার কথা। কলসী বা বালতিতে দড়ি বেঁধে কপিকলের সাহায্যে জল টেনে তোলা হয় ইঁদারা থেকে। শান্তুকে এখন যদি তেমনি করে কেউ কোমরে দড়ি বেঁধে ইঁদারার মধ্যে নামিয়ে দেয়। শান্তু তা হলে সেই কলসীগুলোর মতো 'বক-বক' শব্দ করতে করতে ইঁদারার সমস্ত জলটা খেয়ে শেষ করে ফেলে।

অনেকক্ষণ পরে শান্তুর খেয়াল হয় এক পাও আর হাঁটছে না সে! শুধু হাঁটু ধরে উবু হয়ে বসে হাঁপাচ্ছে।

মাথার ওপর 'দুপুরে সুয্যি'র গনগনে আগুন, আর পায়ের নীচে তার থেকেও গনগনে বালি! পেটের মধ্যেটা খিদের খাক হয়ে যাচ্ছে, আর সমস্ত শরীরটা ঝাঁই-ঝাঁই করছে।

অজানা দেশ আবিষ্কার করা যে এতই কষ্ট তা কে জানত!

আচ্ছা শান্তু যদি একবার ছুট্টে বাড়ী গিয়ে যত পারে জল খেয়ে নিয়ে আবার কাজে লাগে! তা হলে নিশ্চয় নতুন জোর পেয়ে অনেক অনেক হাঁটতে পারে।

কিন্তু বাড়ী ফিরলে আবার বেরোবার আশা আর কোথায়? তা ছাড়া বাবা! বাবা যখন দেখবেন শান্তু তেপান্তরের মাঠ ঘুরে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী এসে কথা বলতে পারছে না, শুধু জল খাচ্ছে—বালতি বালতি জল, তা হলে? তা হলে বাবা কি করবেন শান্তু ভাবতে পারে না। তবু—তবু সেই বাড়ীই তাকে যেন হাজারটা হাত বাড়িয়ে টানতে থাকে।

বাড়ী ফিরলেই এক্ষুনি কলকাতায় ফিরতে হবে। জীবনে আর কখনো দীঘায় আসা হবে না শান্তুর, সমুদ্দুর আর সমুদ্দুরের পারের দেশ যেমন পড়ে ছিল তেমনিই পড়ে থাকবে চিরকাল! তবু ফেরা ছাড়া উপায় কি! তেষ্টায় মরে গিয়ে শান্তুও যদি সেখানে পড়ে থাকে, কী লাভ হবে তা হলে পৃথিবীর?

রোদে আর বালির ঝাপটায় চোখের মধ্যে কর্‌কর করছে, জ্বালা করছে শুধু চোখ নয়, সমস্ত গা। আবিষ্কারক হবার ইচ্ছেটায় আর যেন কোনও জোর থাকছে না।

অন্তত জল না খেয়ে যে কোন কিছুই হওয়া যাবে না, এক মাত্তর 'মড়া' হয়ে যাওয়া ছাড়া, এটা টের পাচ্ছে শানু।

হায় ভগবান!

রাখাল বালক সেজে জলের জালা মাথায় নিয়ে একবার যদি এদিকে এসে পড়তে তুমি, কতটুকু আর কষ্ট হ'ত তোমার? তুমি তো ইচ্ছে করলেই সব কিছু করতে পারো। অথচ সেই ইচ্ছেটুকু তুমি কর না। মানুষ মরে গেলেও তোমার যেন কিছু ক্ষেতি নেই! ছি ছি! 'ভগবান' নাম নিয়ে আকাশে চড়ে বসে থাকার তোমার দরকার কি তা হলে?

ভগবানের দয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে হাঁটু ধরে উঠে পড়ল শানু। বাড়ী গিয়ে জল খেয়ে যা হয় হবে।

যেদিকে চলছিল শানু তার উল্টো দিকে চলতে সুরু করে হাঁটু ধরে ধরে, চোখ কুঁচকে কুঁচকে।

কিন্তু কোথায়? কোন্ দিকে?

কোন্ দিকে বাড়ী শানুদের?

যেদিকে চোখ ফেলছে, দেখছে শুধু রোদলাগা আরশীর মত জলজ্বলে মাঠ। তাকানো যায় না।

তবু কষ্ট করে করে দেখে শানু সেই ছোট্ট লাল রঙের বাড়ীখানির আভাসও দেখা যায় কিনা।

কিন্তু কোথায় কি?

কোন্ দিক দিয়ে এসেছিল শানু?

কোন্ দিকটা ছিল ডানদিক আর কোন্ দিকটা বা বাঁদিক? তাকাতে তাকাতে অবশেষে পাগলের মত চতুর্দিকে ছুটোছুটি করতে থাকে সে।

ক্রমশঃই সব ধোঁয়া হয়ে আসে, দিকহারা শান্তু আর পাগলের মত ছুটতেও পারে না, হাঁটু দুমড়ে দুমড়ে পড়ে, আর এতক্ষণে হঠাৎ মনে হয় তার—সে হারিয়ে গেছে।

শান্তু হারিয়ে গেল!

খবরের কাগজের ছেলেরা যেমন হারিয়ে যায়! যে ছেলেদের কথা বাবা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে মাকে শোনান, 'শুনছো, শুনতে পাচ্ছো—এই দেখ! সাধে কি আর তোমার আদুরে গোপালকে একা খেলতে যেতে মানা করি? কী ভাবে দিন দু'দশটা ছেলে হারাচ্ছে, খোঁজ রাখ না তো!'

শান্তু তা হলে সেই হারানো ছেলেগুলোর মত হারিয়ে গেল!

হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ওঠে শান্তু, 'মা মাগো! মা!'

শান্তু হারিয়ে গেলে মার কি রকম কষ্ট হবে তাই ভেবে ডুকরোনো বেড়েই যেতে লাগল শান্তুর।

কিন্তু শান্তু কি আর ভাবতেই পারছে?

কাঁদতে কাঁদতে ক্রমশঃ শান্তুর চোখ থেকে বিশ্ব চরাচর লুপ্ত হয়ে যায়, মুছে যায় আকাশের আলো।

শরীরের মধ্যে যে অসহ্য একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল তারও আর সাড়া থাকে না।

সেই গরম বালির ওপর অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়ে শান্তু। শুধু যতক্ষণ পর্যন্ত চৈতন্যের রেশটুকু থাকে তার, মনশ্চক্ষে ভাসতে থাকে শুধু মার মুখ। মা ফুলে ফুলে কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে গাড়ীতে গিয়ে উঠছেন, কেঁদে কেঁদে বলছেন, ওরে শান্তুরে, কেন মরতে আমি দীঘায় এসেছিলাম!

মার এই যন্ত্রণায় বুক ফেটে যেতে থাকে শান্তুর।

আবার বাবার নিষ্ঠুরতায় চৌচির হয়ে যায় বুক। বাবা নিশ্চয়ই মার সেই কষ্টের ওপর বকুনি লাগাচ্ছেন! বলছেন, 'হবেই তো।

আগেই জানতাম আমি এসব হবে। দীঘা দীঘা দীঘা! হল তো দীঘায় আসার সুখ! বেশ হয়েছে!'

গাড়ী ছেড়ে দেবে।

শান্তুর মা বাবা মোটঘাট বাক্স-বিছানা নিয়ে দীঘা ছেড়ে চলে যাবেন, আর শান্তু পড়ে থাকবে।

পড়ে থাকবে এই তেপান্তরের মাঠে।

পড়ে থেকে থেকে মরেই যাবে শুকিয়ে কাঠ হয়ে। কেউ তুলবে না শান্তুকে···কেউ একটু জল দেবে না···রোদে শুকিয়ে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে যাবে···ঝড়ে বালি উড়ে উড়ে ঢাকা পড়ে যাবে সে কঙ্কাল···যদি কোনদিন শান্তুকে খুঁজতে আবার দীঘায় আসেন মা, জানতেও পারবেন না শান্তু কোনখানটায়···ভয়ানক একটা কান্নার আবেগে হৃৎপিণ্ডে ধুকধুকুনিটা ঝপ্ করে থেমে গেল।

ভাবনার জগৎ থেকে খসে পড়ে গেল শান্তু। সমুদ্রের শব্দও স্তব্ধ হয়ে গেল তার কাছে!

ক্রমশঃ রোদের তাত কমে এল, বেলা গড়াতে গড়াতে সন্ধ্যায় পৌঁছল, সন্ধ্যা থেকে পৌঁছল রাত্রে। গরম বালি ঠাণ্ডা হতে হতে মায়ের কোলের মত স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। এ সবের কিছুই টের পেল না শান্তু!

টের পেল না কখন সেই গভীর অন্ধকার আবার ফিকে হয়ে এল, আর সেই আব্ছা অন্ধকারে জন তিন-চার কালো কুৎসিত বেঁটে লোক, লম্বা লম্বা এক একখানা বাঁশ ঘাড়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হুমহুম করে সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল!

দাঁড়িয়ে পড়ার সময় তারা সমস্বরে যে একটা দুর্বোধ্য শব্দে চীৎকার করে উঠল, তাও শান্তুর কানে ঢুকল না।

লোকগুলো কাঁধের বাঁশ মাটিতে নামিয়ে নামিয়ে শান্তুর খুব কাছে এসে ঝুঁকে বসল, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল, মাথা নাড়ল।

সাহস করে গায়ে হাতও দিতে পারল না কেউ, অথচ ছেড়েও যেতে পারল না। শানুকে ঘিরে বসেই রইল অনেকক্ষণ। আর নিজেদের মধ্যে ইসারায় ইঙ্গিতে কথা চালাতে লাগল।

ধীরে ধীরে আব্ছা কেটে গেল।

ধীরে ধীরে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত চরাচরে।

আর এতক্ষণে একটা লোক সাহস করে শানুর গায়ে হাত ঠেকালে, আর ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গেই চমকে চেঁচিয়ে উঠল সে।

এ চেঁচানিটা যেন উল্লাসের!

কিন্তু উল্লাস হলেই বা কি, বিষাদ হলেই বা কি! শানু তো কিছুই টের পাচ্ছে না।

চার

টেলিগ্রাম পেয়ে শানুর দুই মামা ছুটে এলেন দীঘায়। মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার!'

শানুর বাবা শুধু কপালে একটা হাত ঠেকালেন।

আর শানুর মা?

থাক, সে কথা আর বেশী লিখে কাজ নেই। পড়ে তোমাদের কান্না পেয়ে যাবে। বুঝতেই তো পারছো সেই মনের অবস্থায়

ভাইদের দেখে কী করলেন তিনি। মামারা বোনকে থামাতেই পারেন না।

ভাইরা এসেছে, তারা কি খাবে না খাবে, সেদিকেও দৃকপাত নেই শান্তুর মার। শান্তু হারানো পর্য্যন্ত এই তিন তিনটে দিন তো রাঁধাও নেই, খাওয়াও নেই শান্তুর মা-বাবার।

খাওয়া-দাওয়া নেই, খালি পরামর্শ আর পরামর্শ। বড় মামা বললেন, 'কলকাতার পুলিশকে জানানো হোক। আর তাদের জানিয়ে দাও তাদের ডিটেকটিভ কুকুর 'লাকি' কিংবা 'মিতা'কে যেন আনে, তাদের নাকের কাছে শান্তুর একটা ছাড়া জামা ধরে দিলেই ব্যস—শান্তুকে চীন জাপান তিব্বত রাশিয়া হাওড়া চব্বিশ পরগণা যে কোন জায়গা থেকে হোক, খুঁজে বার করবেই।

'আর যদি—' শান্তুর মা কেঁদে উঠলেন, 'সমুদ্রের তলায় গিয়ে থাকে শান্তু?'

'কেন সমুদ্রের তলাতেই বা যাবে কেন?' বকে উঠলেন ছোটমামা, 'তোর খালি যত কুভাবনা! বেড়াতে বেরিয়ে পথ হারিয়ে কোন বদলোকেদের পাল্লায় পড়েছে মনে হচ্ছে।'

'বদলোকেদের হাতে পড়া, আর সমুদ্রের তলায় গিয়ে পড়ায় তফাৎ কি ছোড়দা?' চেঁচিয়ে উঠলেন শান্তুর মা, 'যদি কোনও নরখাদক জাতির হাতে পড়ে থাকে?'

'নাঃ তোদের নিয়ে আর পারা যাবে না,' বড়মামা বললেন ধমকে, 'নরখাদক! মাথায় আনাকেও বলিহারী! এ কী আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে? কলকাতার এত কাছে কিনা নরখাদক!'

শান্তুর মা ভাইদের সঙ্গে কথায় নিজের তার্কিক স্বভাব ফিরে পান, কাঁদো-কাঁদো ঝঙ্কারে বলেন, 'থাকে না? আফ্রিকার জঙ্গল ছাড়া নরখাদক থাকে না? কলকাতার এত কাছে থাকে না? তা'হলে সেবার রাঙাদিরা ঝাড়গ্রামে বেড়াতে গিয়ে নরখাদকের হাতে পড়েছিল কেন? মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল না? মনে নেই?'

'না মনে নেই!' আর একবার ধমকে ওঠেন বড়মামা, 'মেয়েদের এই এক বিশ্রী স্বভাব, খালি খারাপটাই ভাববে। আরে আমি বলছি—এমনও হতে পারে, পথ হারিয়ে ফেলে, শানু বুদ্ধি করে কাউকে বলে কয়ে বাসে গিয়ে চড়ে বসে কলকাতার পথে পাড়ি দিয়েছে।'

'হায় ভগবান! তেমনি বুদ্ধিই যদি থাকত!' শানুর বাবা বললেন, 'বুদ্ধি বলে কোন বস্তু ওর মধ্যে আছে না কি? শাস্ত্রে যে বলে—নরাণাং মাতুলক্রমঃ, সেটা সত্যি। ও ঠিক ওর মামাদের মত হয়েছে।'

অন্য সময় হলে এই নিয়ে শানুর মার সঙ্গে শানুর বাবার লেগে যেত একখানা। ভাইদের 'বোকা' অপবাদ সহ্য করতেন না শানুর মা। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা।

তাই চুপ করে থাকলেন শানুর মা।

শুধু শানুর বড়মামা বললেন, 'বোকারা তবু নিজেদের ছেলে-মেয়েগুলোকে না হারিয়ে গুছিয়ে রাখে, আর বুদ্ধিমানেরা—'

শানুর মা বলে উঠলেন, 'এই তো দাদা, ঠিক বলেছ! রাতদিন খালি শাসন আর শাসন! অতটুকু বাছা, পারে কখনও সহ্য করতে? মনের দুঃখে তাই সমুদ্রের জলে—'

শানুর মার সব কথাই শেষ অবধি চোখের জলে ভেসে সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছে।

শানুর বাবা মলিনমুখে বসে বসে ভাবেন, হে ঈশ্বর, একবার যদি ফিরিয়ে দাও শানুকে, চিরজীবনে আর কখনো শাসন করব না। পাঁচ টাকার আইসক্রীম, ছ'টাকার ফুচকা, সাড়ে আট টাকার আলু কাবলী খেতে চাইলেও না!

অতঃপর কলকাতার পুলিশ·····লাকি····· মিতা·····ট্রাঙ্ক কল·····ইত্যাদি নানা কথা চলতে থাকে।

শানুর মা কোন একসময় ঘুমিয়ে পড়েন, আর ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন

দেখেন, শান্তুকে খুঁজতে বেরিয়েছেন তিনি, কত পাহাড়-পর্বত নদনদী পার হচ্ছেন, কত রাস্তাঘাট, কত বড় বড় ব্রীজ সব পার হচ্ছেন হেঁটে হেঁটে, কোথাও পাচ্ছেন না। তারপরে যখন একেবারে আর হাঁটতে পারছেন না, বসে পড়েছেন, তখন কোথা থেকে কে জানে শান্তু এসে মার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ডাক দিয়ে উঠেছে—মা মা মা!

জ্ঞান অজ্ঞানের ঝাপসা ঝাপসা মাথায় জ্ঞানটা যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল, শান্তু আস্তে চোখ খুলে ডাকল, 'মা!'

ওইটুকু পরিশ্রমেই আবার চোখ বুজতে হ'ল বেচারাকে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল, আবার একটু জোরে ডাকল 'মা!' ভাবল এইবার মা ছুটে আসবেন। তাড়াতাড়ি বলবেন, 'কি রে শান্তু? কি বলছিস? জল খাবি? কষ্ট হচ্ছে? মাথায় বাতাস দেবো?'

শান্তু যে কোথায় আছে, শান্তুর ওপর দিয়ে যে কত ঝড় বয়ে গেছে, এসব আর কিচ্ছু মনে নেই শান্তুর। মনে পড়ছেও না। ও ভাবছে কলকাতার বাড়ীতে আছে, অসুখ করেছে ওর। সেই সেবার দেশ থেকে আসার পর যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর হ'ত মাঝে মাঝে। প্রবল জ্বর। তার পরদিন জ্বর ছাড়ার দিন যে রকম শরীরের অবস্থা থাকত, ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে শান্তুর।

মা শুনতেই পাচ্ছেন না!

ভারী অভিমান হ'ল শান্তুর। খুব চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'মা!' আর সেই চেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে চোখটা তার ভাল করে খুলে গেল।

কিন্তু এ কী! এ কী!! এ কী!!!

চোখ খুলে গেল, না চোখ বুজে শুয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে শান্তু? এ কোথায় শুয়ে আছে সে? এ কী রকম ঘর? ঘরের দেওয়ালে ওসব কি ঝুলছে? কি বিশ্রী বিছানায় শুয়ে আছে সে!

দেখে শুনে আর তো 'মা' বলে ডাকবারও সাহস নেই! কী

এসব বোঝবারও ক্ষমতা নেই। শান্তু আবার চোখ বুজল, আর ভাবতে আরম্ভ করল, ব্যাপারটা কি! এসব কোথা থেকে কি হচ্ছে? ভাবতে ভাবতে ক্রমশঃ সব স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মনে পড়ে যায় শান্তুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে নতুন দেশ আবিষ্কার করতে যাচ্ছিল, মাঝখান থেকে কোথা থেকে কি হয়ে গেল! মনে পড়ছে শান্তু গরম বালিতে হাঁটতে হাঁটতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

এরা তা'হলে কুড়িয়ে এনেছে শাকে

কিন্তু এরা কারা? নরখাদক জাতি নয় তো? মা যে সেই একবার গল্প করেছিলেন রাঙামাসীরা নরখাদক জাতির হাতে পড়েছিলেন! অবিশ্যি তারা রাঙামাসীদের খেয়ে ফেলে নি। কারণ খেয়ে ফেললে আর চোখ-মুখ গোল করে সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের গল্পটা করত কে?

কিন্তু শান্তু কি আর তেমন দিন পাবে? চোখ-মুখ গোল করে গল্প করবার দিন? চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে শান্তুর।

একটু পরে সেই গত কালকের কালো কালো বেঁটে বেঁটে রামবিচ্ছিরী লোকগুলোর দুটো এসে ঘরে ঢুকল।

অজানা একটা ভাষায় দুর্বোধ্য একটা শব্দ করল, তারপর শান্তুর মাথার কাছে এসে উবু হয়ে বসে কত কিছু বলল। শান্তু তো সেই বিকটদর্শন লোকগুলো কাছে বসাতেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ফিরে পাওয়া জ্ঞান—আবার হারায় আর কি!

কিন্তু লোক দুটোর মুখ দুঃখু দুঃখু, নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর নয়। কথা ব'লে ওরা বোধহয় বুঝতে পারল কথা কওয়াটা মিথ্যে খাটুনী। এই ক্ষুদে খোকাটা বুঝতে পারবে না। তখন হাত-মুখ নেড়ে ইসারা করে বোঝাতে চেষ্টা করল—'কেমন আছ? খিদে পেয়েছে কি না, কী খাবে?'

হঠাৎ শান্তুর ভয়টা একটু ভেঙ্গে গেল। ওর মনে পড়ল ও আবিষ্কারে বেরিয়েছে, আর একটা অজ্ঞাত দেশে অজ্ঞাত মানুষদের

হাতে এসে পড়েছে। এখন ওকে বুদ্ধির জোরে এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিতে হবে, আর নয় তো বুদ্ধির কৌশলে এদের হাত থেকে পালাতে হবে।

তখন শানুও মাথাটা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ, সে ভাল আছে, আর তার খিদেও পেয়েছে।

ওরা যেন বেশ প্রসন্ন হ'ল।

খুসি-খুসি মুখে কি যেন বলে চলে গেল।

তারপর এল একটা আধ-বুড়ি মতন মেয়েমানুষ। তার একটা হাতে কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় করে কি যেন, আর একটা হাতে মাটির একটা ছোট্ট হাঁড়িতে কি।

শানু তখন সত্যিই খিদেয় যাকে বলে চোখে কানে দেখতে পাচ্ছে না। ও হাত বাড়াল। কিন্তু বুড়িটা মাটিতে পাতাটা আর ভাঁড়টা নামিয়ে রেখে ইসারায় বলল, 'খাও, আমি যাচ্ছি।'

কিন্তু ঝপ্ করে খাবে কি করে?

জিনিসটা কী?

মাটির ছোট্ট ওই হাঁড়ি মতনটায় অবশ্য দুধ রয়েছে দেখা যাচ্ছে কিন্তু খাবে কি করে শানু? হাঁড়িশুদ্ধু গলায় ঢালবে না কি? তা ছাড়া পাতায় ওই যেটা রয়েছে? মনে হচ্ছে কিছুর মাংস। কিন্তু একেবারে কেলেকিষ্টি, আর শুকনো শুকনো। কেমন কেমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছে।

খাবার ইচ্ছে মনেই রেখে শানু বোকার মত বসে রইল, আর একটু পরে হঠাৎ ভগবানের আশীর্বাদের মত একটা জিনিস ঘরে এসে পড়ল।

ঠিক 'জিনিস' অবিশ্যি বলা চলে কি জানি না। মানুষকে যদি জিনিস বলা যায় তো জিনিস। একটা প্রায় শানুর বয়সী ছেলে ব্যাঙের মত থপাস করে লাফিয়ে ঝুপ্ করে এসে পড়ে বলে উঠল, 'কি রে খাস নি?'

ছেলেটা যে একটা কেলে বিচ্ছিরী খাঙড়-মেথরের মত শুধু একটু কোপনি পরা, আর সেই ছেলেটা যে শান্তুকে 'তুই' বলছে, সে কথা মনে পড়ল না শান্তুর। ও শুধু মোহিত হয়ে শুনল ছেলেটা বাংলা কথা কইল।

সেইটাই ভগবানের আশীর্বাদের মত।

'তুই বাংলা কথা জনিস্?'

বিগলিত আনন্দে বলে উঠল শান্তু।

'বাংলা? হিঃ জানি!'

বলল ছেলেটা। তারপর বলল, 'আমরা তো বাঙ্গালীই হই।'

'তুই কাদের ছেলে?'

'এই এদের।'

'ধেৎ! এরা বুঝি বাঙ্গালী?'

'হিঃ তো!'

বলে ছেলেটা হঠাৎ একটা পাক খেয়ে মস্ত একটা ডিগবাজি মেরে হি হি করে হেসে উঠল।

'সত্যি বল না রে!' শান্তু কাতরভাবে বলে।

'সত্যি বলছি তো রে! এরা সব বাঙ্গালী। ওই বুড়িটা আমার দিদিমা হয়! আর ওরা আমার মামা হয়।'

শান্তু বলে, 'তা হলে ওরা অন্য বিচ্ছিরী ভাষায় কথা বলে কেন?'

ছেলেটা বোধ হয় 'ভাষা' কথাটা বুঝতে পারে না, চোখ কুঁচকে বলে, 'কি বলছিস্?'

শান্তু বলে, 'বলছি ওরা তোর মতন কথা বলতে পারে না কেন?'

'ওরা? ওরা যে এখেন থেকে কক্ষণো কোথাও যায় না। আমি একবার পালিয়ে গেছলাম। হুই কলকেতায় চলে গেছলাম!'

'কলকাতায়! কলকাতায় গিছলি তুই?'

'হিঃ! মাণিকতলাও বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে একটা ফলওলার কাছে রইলাম কেতক দিন! আর কেতক দিন রাস্তায়

রাস্তায় ঘুরলাম। তারপর মায়ের লেগে মন উদাস হ'ল, চলে এলাম।'

'মায়ের লেগে মন উদাস,' শুনেই শান্তুর চোখ দুটো আবার ভিজে ওঠে। তারপর মন ভাল করে নিয়ে বলে, 'কই তোর মা?'

'হুই ওদিকে আছে।'

'বাংলা কথা বলতে পারে?'

'নাঃ!' ছেলেটা আর একবার একটা ডিগবাজি খেয়ে বলে, 'কিন্তুক আমরা বাঙ্গালী।'

'কি নাম তোর?'

'আমার নাম নারায়ণ।'

'নারায়ণ! নারায়ণ তোর নাম? তোর বাবার নাম?'

'বাবা নেই। বাবা মরে গেছে।'

বাবা মরে গেছে!

শুনেই শান্তুর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। বাবা আবার মরেও যায় লোকের!

'কেন, মরে গেছে কেন?' আস্তে সাবধানে বলে শান্তু।

কিন্তু নারায়ণের মধ্যে কোন দুঃখের বালাই নেই। সে অবহেলা ভরে বলে, 'কে জানে। ঝড়ে মরে গেছে বলে। আমি তো তখন এইটুকু ক্ষুদে।'

শান্তু মলিনমুখে বলে, 'তোর কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট?' ও আর এক পাক ঘুরে বলে, 'হলে কি হবে? বাবাটা কি চলে আসবে হুই ওখান থেকে?' বলে আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ছেলেটা নিজস্ব স্বভাবে হি হি করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, 'তোর নাম কি?'

'আমার নাম শ্রীশান্তনু রায়।

ছেলেটার চোখ-মুখ আবার কুঁচকে যায়।

'কী বললি?'

শান্তু গম্ভীরভাবে বলে, 'আমার নাম শান্তু।'

'শান্তু! তোর নাম শান্তু! বেশ নাম। তুই খাবি না?'

'এসব কি?'

'এটা তো দুধ। দুধ খাস না তুই? কলকেতায় তো মানুষরা দুধ খায়।'

'খাই। এই রকম বিচ্ছিরী হাঁড়িতে খাওয়া যায়?'

নারায়ণ গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, 'আমাদের ওই আছে।'

'আমি খেতে পারব না।'

'তবে কি করবি? পাতার দোনা করে দেব? ঢেলে খাবি?'

'জানি না।'

নারায়ণ দুঃখিতভাবে বলে, 'না খেয়ে তুই যে মরে যাবি? দুধ খেয়ে ফেল। কিন্তুক এই মাংসটা তুই খেতে পারবি না। কলকেতায় কাকের মাংস কেউ খায় না।'

'কিসের মাংস?'

শিউরে ওঠে শান্তু।

'কাক! কাক জানিস্ না? কলকেতায় তো কত আছে। তুই দেখিস্ নি? হুই আকাশে ওড়ে। এই আমার মাথার মতন রংদার—?'

নিজের কালো চুলে ভরা মাথাটায় হাত বুলোয় নারায়ণ।

'কাকের মাংস খেতে দিয়েছিস আমায়?'

চেঁচিয়ে ওঠে শান্তু।

চোখ ফেটে জল আসে তার।

নারায়ণ না হেসে বলে, 'আমরা যে কাকমারা! কাকের মাংস খাই আমরা। আমার মামারা রোজ সুয্যি দেবতা উঠলেই কাক মারতে চলে যায়। আর ওই খায়।'

'এঃ ছিঃ!' শান্তু চোখ পাকিয়ে বলে, 'আবার বলছিস্ কি না বাঙ্গালী!'

'ওটা সত্যি বলছি। ঠিক। 'কাকমারা'রা বাঙ্গালী।'

'আচ্ছা বেশ! খুব জানিস তুই। এখন বল তো, আমি কি করে যেতে পারব?'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার!' শান্তু বিরক্ত হয়ে বলে, 'আমার মার কাছে, বাবার কাছে!'

'কোথায় থাকে তোর মা?'

'বাড়ীতে থাকে। আবার কি!'

'তোকে ভালবাসে?'

'ভালবাসে না? খুব ভালবাসে।'

'তবে তুই পালিয়ে গেলি কেন? আমার মা দুই-একদিন আমাকে মারল, তাই আমি পালিয়ে গেলাম।'

'আমি কি পালিয়ে এসেছি না কি? আমি তো হারিয়ে গেছি।'

নারায়ণ মুখ গম্ভীর করে বলে, 'ও!'

তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, 'তুই মরে গিয়েছিলি। বড় মামাটা তোকে 'বিশলাই' পাতার রস দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

শান্তু হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বলে, 'তোর বড় মামা মরা লোককে বাঁচিয়ে দিতে পারে?'

'পারে তো!'

'তা হলে তোর বাবাকে বাঁচিয়ে দিল না কেন?'

'ইস্! বাঁচিয়ে দেবে! বাবার সঙ্গে লড়াই না! কিন্তুক তুই দুধটা খা।'

শান্তুর তখন একটু কিছু খাবার জন্যে প্রাণের মধ্যে কী যেন করছে। তাই 'খাব না' বলে রাগ না করে কাতরভাবে বলে, 'কি করে খাব? পড়ে যাবে।'

'তুই তবে হাঁ কর, আমি ঢেলে দিই।'

অগত্যাই হাঁ করে শান্তু, আর জিগ্যেস করে, 'এ কিসের দুধ ?'

'গাই ! গাই ! গাই জানিস্ না ? গোরু।'

'ওঃ !'

হঠাৎ হেসে ফেলে শান্তু বলে, 'তোরা তো কাকের মাংস খাস, তবে গোরুর দুধ খাস কেন ? কুকুরের দুধ খেতে পারিস্ না ?'

কুকুরের দুধ শুনে ছেলেটা হেসে লুটিয়ে পড়ে। তারপর সামলে নিয়ে বলে, 'এই শোন, এসব কথা ওদের বলবি না। তা হলে ওরা তোকে মারবে। হাঁ কর।'

নাক-মুখ সিটকে একটু দুধ খেয়ে শান্তু বলে, 'গন্ধ ! আর খাব না। তুই আমাকে রাস্তা চিনিয়ে দিতে পারবি ? ওই অনেক দূরে যেখানে দোকান আছে, হোটেল আছে, রাজবাড়ী আছে—'

নারায়ণ মাথা নেড়ে বলে, 'জানি না !'

'জানিস্ না ?' শান্তু রেগে লাল হয়ে বলে, 'তা জানিস্ না, আর কলকাতার মাণিকতলা জানিস্ !'

'ইস্ তুই রাগ করছিস্ !'

'না রাগ করব না ! ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়াব তোকে।'

'কী খাওয়াবি ?'

'কিছু না ! আমি এক্ষুণি চলে যাব।'

নারায়ণ তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল চেপে চুপি চুপি বলে, 'এই চুপ। ওরা শুনতে পেলে বেঁধে রাখবে তোকে।'

'বেঁধে রাখবে ! ঈস্ ! বেঁধে রাখলেই হ'ল ! পুলিশে ধরিয়ে দেব না ?'

সতেজে বলে শান্তু অর্থাৎ নারায়ণের কাছে তেজ দেখায়।

'পুলিশ !'

নারায়ণের মুখে একটি বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, বলে, 'কোথায় পাবি ? ওরা তো তোকে আটকে রেখেছে। যেই পালাতে যাবি,

ধরে ফেলবে। আমার ওই দিদিমা বুড়িটা না ভারী শয়তান! ও মামাদের বলেছে, তোকে আটকে রেখে অনেক টাকা করতে!'

শান্তু আরও রেগে উঠে বলে, 'আমায় আটকে রেখে টাকা কোথায় পাবে রে? আমার কাছে কি টাকা আছে?'

'না না—' নারায়ণ বেশ কায়দায় মাথাটি ঘুরিয়ে বলে, 'দিদিমা বলেছে, তুই হারিয়ে গেছিস বলে তোর মা-বাবা পুলিশকে বলবে, যে তোকে খুঁজে দেবে, অনেক টাকা দেবে তাকে। তখন বড় মামাটা তোকে 'খুঁজে' দিয়ে আসবে। বলবে—মরে গিয়েছিল, বাঁচিয়ে দিয়েছি। বেশী বখশিশ চাই!'

শান্তু এবার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! ওই বিচ্ছিরী কোপনি-পরা লোকগুলো আর ওই বিচ্ছিরী হাঁদার মত বুড়িটা, তাদের মধ্যে এত চালাকি!

কাতরভাবে বলে, 'তুই তো ওদের মত না, তুই তো বেশ ভাল। তোকে আমার বন্ধু করে নেব।'

'করে নিলি তো কী হ'ল?'

'তা হলে তুই আমায় নিয়ে যাবি!'

'আমায় মারবে।'

'রাত্তির বেলা, লুকিয়ে লুকিয়ে যাব।'

'ধরে ফেলবে!'

'না ধরে ফেলবে না', চেঁচিয়ে ওঠে শান্তু, 'তুই সব বানাচ্ছিস্।'

'কী করছি?'

'তুই মিছিমিছি বলছিস্!'

'বেশ তাই ভাল!' বলে নারায়ণ আর একটা ডিগবাজি খেয়ে বলে, 'আমাকে বন্ধু করার তোর দরকার নেই। আমি চলে যাচ্ছি।'

আরে আরে সত্যিই যে চলে যায়।

শান্তু হঠাৎ সেই কালো নোংরা ছেলেটার একটা হাত ধরে বলে ওঠে, 'রাগ করিস্‌নি ভাই!'

নারায়ণ গম্ভীরভাবে বলে, 'বেশ রাগ করছি না। বন্ধু হচ্ছি। তোকে আমি এদের কাছ থেকে পালিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু তাড়াতাড়ি হবে না। দু'চার দিন দেরী হতে পারে।'

'আমি তো তা হলে না খেয়ে মরেই যাব।'

নারায়ণ আরও গম্ভীরভাবে বলে, 'কেন! দুধটা খাবি। দুধ হচ্ছে ভগবান! ওটা খেলেই বেঁচে থাকে মানুষ।'

'বেশ খাব। তুই আমায় নিয়ে যাবি?'

'বলছি তো!...এই এই—বুড়ি আসছে। যদি বলে, মাংস খাসনি কেন? তুই পেটে হাত দিয়ে বলবি, পেটে দুখ্ হচ্ছে।'

নিজের পেটে হাত দিয়ে দেখিয়ে, একপাক ডিগবাজি খেয়ে হি হি করে হাসতে থাকে নারায়ণ।

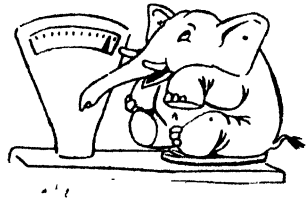

পাঁচ

এরপরই ঠক্‌ঠক্ খট্‌খট্ করতে করতে বুড়িটা আসে। বুড়ির কোমরে একটা কাপড়ের টুকরো আছে বটে, কিন্তু সেটা আর হাঁটুর নীচে নামেনি। পা দুটো কেলে সরু বিচ্ছিরি। শামু-ভাবল কাক খেয়েই বোধ হয় বুড়ির কাকের মত পা।

নারায়ণ চুপি চুপি বলে, 'এই শোন। বুড়ি আমায় ডিংলাই ডাকে। কান রাখ, বুঝে যাবি কি বলবে বুড়ি।'

শান্তু কান রাখে।

কিন্তু কচুপোড়া! বুড়ি এসেই ভাঙা কাঁসির মত শব্দে নারায়ণকে উদ্দেশ করে যে একগাদা কথা বলে যায়, শান্তু তার এক বর্ণও বুঝতে পারে না। শুধু বারে বারে ওই ডিংলাই শব্দটাই কানে আসে।

শান্তু ভাবে, আবার বলে কি না বাঙালী! তা হতেও বা পারে। রাঙামাসীরা যে নরখাদকের হাতে পড়েছিল তারাও নাকি বাঙালী। মানে বাংলাদেশেরই তো লোক। শুধু এখনো আদিবাসীত্ব ঘোচেনি বলেই—

বুড়ি এবার নিজের নাতিকে ছেড়ে শান্তুর দিকে চোখ পাকিয়ে, আর সেই কেলেকিষ্টি মাংস চচ্চড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলে ওঠে।

শান্তু ডিংলাইয়ের কথামত পেটে হাত দিয়ে পেটব্যথার ইসারা করে।

বুড়ি থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন একটা বলে ওঠে। আর ডিংলাই বা নারায়ণ তেমনি এক পাক নেচে নিয়ে ব্যাঙের মত ঝুপ্ করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পড়ে।

এরপর বুড়ি নাতির একটা হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায়। অবশ্য তার সঙ্গে বকতে বকতে যায়।

শান্তুর মনে পড়ে যায় তার দিদিমা আর ছোটমামার ছেলেটার কথা। ভীষণ দুষ্টু ছেলেটা! চান করতে, খেতে, সাজতে, চুল আঁচড়াতে, সব সময় ঝুলে পড়ে। আর দিদিমা তাকে অমনি করে টানতে টানতে আর বকতে বকতে নিয়ে যান।

কিন্তু দিদিমার কথাগুলো কেমন সুন্দর বোঝা যায়। আর এই বুড়িটার? ইস্! কথা বলেই মনে হচ্ছে না যেন বাজে বাজে চেঁচাচ্ছেই শুধু। আচ্ছা পৃথিবীতে এত রকম ভাষা কেন? সবাই যদি এক ভাষায় কথা বলত তা হলে তো কারুরই কোন কষ্ট থাকত না!

পৃথিবীর সবাই তো খিদে পেলে খায়, ঘুম পেলে ঘুমোয়, রাগ হলে চেঁচায়, দুঃখু হলে কাঁদে, আহ্লাদ হলে হাসে, তবে কথায় এত তফাৎ কেন? অন্য জাত থাকবার দরকার কি? সবাই এক জাত হলেই তো বেশ হয়।

শানুর মনে হয়, শানু যদি বড় হয়ে পৃথিবীর রাজা হয়ে যায়, তা হলে পৃথিবীর সমস্ত লোককে সমান বড়লোক, সমান বিদ্বান, আর সমান জাত করে দেবে।

কিন্তু হায়, শানু আর কিছু হয়েছে!

শানু এই বুনোদের হাতেই মরে শেষ হয়ে যাবে।

ধপাস্!

ঘরে এসে পড়ল সেই প্রকাণ্ড কোলাব্যাঙটা। তার গলায় একটা ছোট মাটির ভাঁড় মাদুলির মত দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

শানু চোখ পাকিয়ে বলল, 'তুই ওরকম করে হাঁটিস কেন রে? তুই কি ব্যাঙ?'

ব্যাঙ কথাটার মানে বুঝল না ডিংলাই। গোড়ার কথাটা ধরেই বলল, 'ওইটা আমার ইচ্ছে।'

'আহা কী চমৎকার ইচ্ছে! গলায় কী ঝুলিয়েছিস?'

'তোর ওষুধ! মিঠে মিঠে আঃ!'

জিভের জলটা টেনে নিলে সে।

'বিচ্ছিরি ওষুধ!'—বলল শানু।

'তোদের কলকেতার মতন ডাক্তর ওষুধ দেয় নাকি এখেনে? কলওলা আমায় একদিন ডাক্তরের ওষুধ দিয়েছিল, এ্যাঃ থুঃ! বুকে জ্বালা লাগে। এটা ভাল। মাছির রস হচ্ছে এটা।'

মাছির রস!

মাছির রস এনেছে শান্তুর জন্যে !

তার থেকে একটু বিষই কেন এনে দিক না—যা খেলে মানুষ মরে যায়। মাছির রসকে ওষুধ বলে না চালিয়ে—

শান্তু চেঁচিয়ে ওঠে, 'তোরা বুঝি একানড়ে ? তাই কাকের মাংস খাস, মাছির রস খাস !'

নারায়ণ বোধহয় বুঝতে পারে শান্তুর ঘেন্না করছে। তাই গলার ভাঁড় খুলে নামিয়ে নিজে একটুখানি হাতে ঢেলে বলে, 'এই দেখ আমি চেটে পুটে খেয়ে দিচ্ছি।'

হাতের জিনিসটা শান্তুকে দেখায় সে।

কী ওটা !

শান্তু চোখ কুঁচকে দেখে। মধু নাকি ? সেই রকমই দেখতে লাগল। আর যে রকম চেটে পুটে খাচ্ছে ডিংলাই !

ডিংলাই। হ্যাঁ ওইটাই ওর উপযুক্ত নাম। ব্যাংলাফাই হলে আরও ঠিক হ'ত।

নারায়ণ বলবে না হাতী করবে !

'দেখছিস তো ? খেয়ে দিলাম।'

শান্তু তীব্রস্বরে বলে, 'তুই খাবি না কেন ? নোংরা অসভ্য ভূত একানড়ে !'

ডিংলাই হঠাৎ যেন কী রকম ভ্যাবাগঙ্গা হয়ে যায়। হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'তুই বন্ধু হলি না ?'

এবার শান্তুর লজ্জার পালা।

অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে শান্তু বলে, 'তা বন্ধু তো। কিন্তু তুই অমন অসভ্য কেন ?'

'আমরা অমনি ! আমরা যে কাকমারা। তোদের কলকেতার মত সব্য হলে আমাদের মন্দ বলে।'

'তোরা কাকমারা হতে গেলি কেন ?'

'আমরা কি হয়েছি ? ওই আকাশের দেবতা করেছে।'

'তুই যদি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাস, তোকে আমি "বাবু" করে দিতে পারি।'

'নাঃ!'

ডিংলাই মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বলে, 'বাবুটা হতে মন নেই আমার।'

'এই রকম করে থাকতে মন?'

'তাই তো! বাবুটা হয়ে কী হবে?'

'তোর কথাগুলো ভারী বোকার মত। লেখাপড়া শিখবি, মানুষ হবি, আবার কী হবে?'

ডিংলাই আর লম্ফঝম্ফ করে না, বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'মাটা যে কাঁদবে।'

মা! মা কাঁদবে!

ঘুরে ফিরে সেই মাকে মনে পড়িয়ে দেওয়া কথা! মা, মাগো!

হঠাৎ শানু উপুড় হয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ডিংলাই কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে তেমনি বিষণ্ণভাবে আপন মনে মাথা নেড়ে নেড়ে বিজ-বিজ করে কি যেন বলে, তারপর আস্তে আস্তে উঠে যায়।

অনেকক্ষণ পরে আবার নিজেই চোখ মেলে উঠে বসে শানু। ভোলাবার কেউ না থাকলে নিজে নিজেই ভুলতে হয়। শরীর দুর্বল, ঘুমুতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি করে ঘুমুবে? বিশ্রী একটা আঁসটে আঁসটে পচা চামড়ার মত গন্ধে শরীরের মধ্যে পাক দিচ্ছে।

ঘরটার মধ্যেই গন্ধ!

কী দিয়ে তৈরি করেছে ঘরখানা?

শানু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, এই ঘরে ওরা চিরকাল থাকে? বৃষ্টি পড়লে কী অবস্থা হয়? ঝড় হলে কী অবস্থা হয়?

ছোট ছেলেরা যেন খেলাঘর বানিয়েছে—না তো কার্নিশের গায়ে পাখীর বাসা!

হেন জিনিস নেই, যা এই ঘরখানার গায়ে মাথায় নেই। নেই শুধু যা দিয়ে ঘর বানাতে হয়। ইঁট, চুণ, সুরকি, সিমেন্ট তো ছেড়েই দাও, বাঁশ বাখারি খড় মাটি এসবও নেই। আছে গাছের ডালপালা ছেঁড়া চট, টিনের টুকরো, ভাঙা দরমার খণ্ড, টায়ারের রবার, জন্তুর চামড়া, এইসব হরেক মাল। কোথা থেকে যে যোগাড় করেছে এসব কে জানে।

হরেক মাল দিয়ে ঘর তৈরী, তাই হরেক ফুটো-ফাটা। সে সব ফুটো-ফাটা দিয়ে বাইরের আলো ঢুকছে। কোন জিনিসটাই তো সোজা নয়। সোজা দেয়াল হবে কোথা থেকে?

অন্য সময় হলে, মা-বাবার সঙ্গে এসে দেখলে এ রকম ঘরের দৃশ্যে হেসে কুটিকুটি হ'ত শানু। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। এখন কান্না পাওয়া ছাড়া কিছুই পাচ্ছে না শানুর।

তবু বসে থাকতে থাকতে শানু হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ওর মনে হয় সত্যিই যেন ও দূর-দূরান্তরে কোন অজানা দেশে চলে এসেছে; পৃথিবীর এক অনাবিষ্কৃত দেশে।

ইস্! শানু যদি আর একটুখানি বড় হ'ত! যদি মায়ের কথা মনে করতে গেলেই চোখে জল না আসত!

আবার তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবল শানু, বৃষ্টির সময় কি করে এরা?

কিন্তু শানু, তো আর জানে না, সারা বছর এরা এখানে থাকেই না। কোনখানেই ঘর-সংসার নিয়ে থাকে না এই 'কাকমারারা'। কিছুদিন এমনিভাবে পাখীর বাসার মত বাসা বানায়, কাক মেরে, মাছ মেরে পেট ভরায়, আবার হঠাৎ একদিন মেয়ে-পুরুষে বাঁশের আগায় পুঁটুলি বেঁধে যার যা সম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাসা ভেঙে।

হয়তো গিয়ে আশ্রয় নেয় কোন হাটতলায় কি কোন মেলার বাজারে। এদিক ওদিক ঘোরে, মেয়েরা চেয়ে চিন্তে কাচের চুড়ি যোগাড় করে হাতে পরে, চিরুণী যোগাড় করে চুল আঁচড়ায়, ছেলেরা

যোগাড় করে ছেঁড়া চট, ভাঙা দরমা, ফুটো টায়ার, তারপর আবার লাঠির আগায় পুঁটুলি বাঁধে।

চাষবাসের ধারদিয়েও যায় না এরা। তবু বারে বারে শহর-বাজারের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে পেটে পেটে সেয়ানা হয়ে উঠেছে এরা বেশ। তাই নারায়ণের দিদিমা যুক্তি করে কুড়িয়েপাওয়া ছেলেটাকে আটকে রেখে ওর মা-বাপের কাছ থেকে বকশিশ আদায় করতে।

শানু এত কথা কিছুই জানে না।

শানুর ভরসা এখন শুধু ডিংলাই—যার ভাল নাম নারায়ণ।

আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল শানু মনে নেই। অত বিশ্রী গন্ধের মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। ক্ষিধেয় তেষ্টায় কষ্টে অবসন্নতার ঘুম আর কি! তারপর কখন বেলা পড়ে এসেছে, ডিংলাইয়ের মামারা শিকার করে বাড়ী ফিরে কাকের পালক ছাড়াতে বসেছে, আর ডিংলাইয়ের মা-দিদিমা গাছের ডালপালা জ্বেলে তাই রান্না করবার ব্যবস্থা করেছে। গোটা-চারেক মরা কাক এক পাশে রাখা আছে, ওইগুলো বদলে ডিংলাইয়ের দিদিমা কোথা থেকে যেন দুধ নিয়ে আসবে ভোরবেলা গিয়ে।

ডিংলাই একবার চারদিক দেখে শুনে শানুর কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। আস্তে আস্তে ওর মাথাটা ঠেলে চুপি চুপি বলল, 'এই, ভাগবি?'

ভাগবি!

শানু ঘুম-চোখে উঠে প্রথমটায় মানে বুঝতে পারল না। বলল, 'কি বলছিস?'

ডিংলাই এবার চোখ-মুখ আর হাতের ইসারায় প্রস্তাবটা বুঝিয়ে দিল।

শানুর শরীরে তখন শুধু ক্লান্তি আর দুর্বলতা। তবু শুনেই

ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর বলল, 'ওরা দেখতে পাবে না?'

'নাঃ। ওরা উদিকে রইছে।'

'আমার জুতোটা!'

কাতরভাবে এদিক ওদিক দেখতে লাগল শানু।

'ইটা?'

ডিংলাই কোথা থেকে টেনে আনল জুতো দুটো। একপাটি মোজা একটা জুতোর মধ্যে রয়েছে, আর একপাটি কোথায় কে জানে।

কিন্তু চুলোয় যাক মোজা!

খালি জুতো পরেই আস্তে আস্তে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল শানু। দেখল খানিকটা দূরে একটা বালির গাদায় বাতাসে কেঁপে কেঁপে একটা আগুন জ্বলছে, গোটাকতক লোক সেই আগুনটাকে ঘিরে বসে হাতমুখ নাড়ছে, কথা বলছে।

এদিকে কারো দৃষ্টিই নেই।

কুঁড়েঘরের পিছন দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল ওরা—যেমন করে সেদিন রান্নাঘরের পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল শানু মা-বাবার চোখে ধুলো দিয়ে।

বেলা পড়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যে হয় হয়।

খানিকটা গিয়ে শানু ডিংলাইকে বলে, 'এক্ষুণি তো অন্ধকার হয়ে যাবে, কি করে রাস্তা চেনা যাবে?'

ডিংলাই ইসারায় বলে, 'চাঁদের আলো উঠবে এখুনি। কথা বলবে না, কে জানে কে কোনদিকে কান পেতে রেখেছে।'

শানু জানে না: কাথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে ডিংলাই। ডিংলাই জানে কোথায় যেতে হবে। ওই যেখানে লম্বা লম্বা বড় বড় গাড়ী-

গুলো দাঁড়িয়ে থাকে—মানুষগুলোকে পেটের মধ্যে ভরে ফেলে গোঁ-গোঁ করে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে কলের গাড়ীর কাছে তাদের পৌঁছে দিতে। সেইখানে বন্ধুটাকে নিয়ে যাবে ডিংলাই। ওই গাড়ীর পেটের মধ্যে বন্ধুটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে আসবে।

কিন্তু মুস্কিল ওই, ওরা এমনি শুধু নিতে চায় না—পয়সা চায়।

কলকাতায় গিয়ে পয়সা জিনিসটাকে বেশ চিনে এসেছে ডিংলাই। আর—এটাও জেনে এসেছে কাকমারারা বাদে জগতের আর সবাই যা কিছু করে পয়সা নিয়ে।

'তোর পয়সা আছে?'

অনেকটা দূরে এসে প্রশ্ন করে নারায়ণ।

পয়সা!

আকাশ থেকে পড়ে যেন শান্তু।

পয়সা আবার এখানে কোথা? সে তো আছে বাড়ীতে কাটা বাক্সয়। অনেক পয়সা! কাটা বাক্সটা ভারী হয়ে উঠেছিল ইদানীং।

কিন্তু পকেটে? নাঃ!

আস্তে মাথা নাড়ে শান্তু। আর তাই না দেখে নেংটিপরা—ডিংলাই হঠাৎ পথের মাঝখানেই এক পাক নেচে নিয়ে মাথার উপর হাত তুলে বুড়ো আঙ্গুল দুটো দুলিয়ে হি হি করে ওঠে, অর্থাৎ তা হলে যাওয়ার আশায় কলা!

শান্তু রেগে উঠে বলে, 'হি হি করে হাসছিস যে?'

'তবে কি করব? কানব?'

'মারব তোকে।'

'মার।'

আরও দাঁত বার করে হাসে ডিংলাই। হেসে বলে, 'পয়সা না দিলে টিকিস দেবে?'

শান্তু হঠাৎ বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে বলে, 'আমি বলব—এখন

আমাকে অমনি টিকিট দাও। বাড়ী পৌঁছে ডবলের ডবল টাকা পাঠিয়ে দেব।'

'কি দিবি?'

চোখ কুঁচকে বলে ডিংলাই।

'ইস! কী বোকা! বলছি অনেক টাকা দেব।'

অনেক টাকা!

দিনের আলো নিভে গেছে।

কিন্তু শুক্লপক্ষের চাঁদ একটু একটু আলো ছড়াচ্ছে। ডিংলাইকে একটা ছায়ামূর্ত্তির মত দেখাচ্ছে। সেই ছায়ামূর্ত্তি থেকে কথা বেরোয়, 'তোর অনেক টাকা আছে?'

'আছে। কেন থাকবে না? বাড়ীতে আছে।'—সজোরে বলে ওঠে শান্তু।

ডিংলাই মনমরা ভাবে বলে, 'তুই রাজার বেটা?'

'যা! রাজা কি!'

'হ্যাঃ তুই রাজা! তুই আমার বন্ধু না।'

ওর এই মনমরা কথায় শান্তুরও হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে যায়। ওর গায়ে একটা হাত রেখে বলে, 'না রে, আমি তোর খুব বন্ধু হ'ব। চল না তুই আমার সঙ্গে।'

ডিংলাই কি উত্তর দিত কে জানে, হঠাৎ পিছন থেকে কর্কশ গলার বিশ্রী আওয়াজে দু'জনেই চমকে ওঠে।

পিছনে আর কেউ নয়—ডিংলাইয়ের ছোট মামা।

ভাগ্নের মাথাটা ধরে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চীৎকার করে ধমক দিতে থাকে সে, হাত নাড়ে মুখ নাড়ে, তারপর এক হাতে শান্তুর একটা হাত আর অপর হাতে ডিংলাইয়ের একটা কান ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায় নিজেদের আস্তানায়।

শান্তুর হাত-পা ছোঁড়া, এবং 'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও' চীৎকার কিছুই কাজে লাগে না।

আবার ওদের আস্তানায়?

সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে যায় শানু। দেখে ঘরটা ভাঙতে সুরু করে দিয়েছে ডিংলাইয়ের বড় মামা। বুড়ি তার থেকে চটের টুকরো, ন্যাকড়ার কালি, রবারের পাত বেছে বেছে জড় করছে।

এদিকে সেই পাতার জ্বাল দিয়ে দিয়ে রান্না হচ্ছে। ভাত ফোটার গন্ধ বেরোচ্ছে। ভাত। হঠাৎ শানুর মনে হয় জীবনে কখনো এমন সুগন্ধ সে পায় নি।

মামার কাছে কান হিঁচড়ানো খেয়ে গোঁজ হয়ে বসেছিল ডিংলাই। খানিক পরে ওর মা ডাকতে আসে। শানুকেও ডাকে, অবশ্য ইসারায়।

ভাত খেতে খুব ইচ্ছে করছিল শানুর, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিল না কি দিয়ে খেতে দেবে। তবু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। ডিংলাইও দু'চার বার 'যাব না, খাব না' গোছের তেজ দেখিয়ে উঠে গেল।

বালির ওপর কাঁচা শালপাতা পেতে পেতে ভাত সাজিয়েছে ডিংলাইয়ের মা—সারি সারি নয়, গোল করে ঘিরে।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের ভাতের ওপরই সেই কেলে কিষ্টি খানিকটা মাংস। শুধু শানুর ভাতের ওপর?

অবাক হয়ে দেখল শানু। শানুর বাবা মা যেমন আস্ত আস্ত মাছভাজা খান তেমনি একটা আস্ত মাছ। কে জানে ভাজা না সেদ্ধ।

কিন্তু ও তো কাঁটা মাছ।

ও মাছ তো শানু খেতেই পারে না। মা কাঁটা বেছে দিয়ে খাবার জন্যে সাধেন, তবু খায় না। পাতার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে আড়ষ্ট হয়ে। তবুও এদের ওপর একটু কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা দেখে। কাকের মাংস যে দেয় নি তাকে এই ঢের।

ডিংলাই চুপি চুপি বলে, 'খেয়ে নে। না খেয়ে খেয়ে মরে যাচ্ছিস যে তুই। তোর লেগে ভাত করেছে। আমরাও তোর লেগে মজা করছি।'

শানু আস্তে আস্তে বসে পড়ে। আর বসে এক গ্রাস ভাতও মুখে পুরে দেয়।

কেমন এক রকম ধোঁয়া-ধোঁয়া গন্ধ। তবু চোখ-কান বুজে খেয়ে নেয় একটু। মাছটায় হাত দিতে ভরসা পায় না কাঁটার ভয়ে, শুধু ভাতই খায়। যে শানুকে ভাত খাওয়াতে হিমশিম খেয়ে যান মা, দুধ সন্দেশ ছানা ফল নিয়ে পিছু পিছু ঘোরেন।

শানুর একটা নিশ্বাস পড়ে।

দু'চার বার খাবার পর আর খেতে পারে না। আর অবাক হয়ে দেখে ডিংলাই সমস্ত চেটে পুটে খেয়ে নিয়ে ওর মাকে ইসারা করছে আরও ভাত দেবার জন্যে। ওর মাও ইসারা করে জানায়, 'আর নেই।'

ডিংলাইয়ের মামারা তখন খেয়েই চলেছে। অবাক হয়ে ভাবে শানু—ছেলে ভাত চাইল, আর মা দিল না। তবু ওই মাকে ভালবাসে ডিংলাই। আর কী বিচ্ছিরি মা। ঠিক বুড়িটার মতই খাটো কাপড় পরা, অমনি শুকনো কালো কালো হাত-পা।

এই মাকেই এত ভালবাসে ডিংলাই।

যদি শানুর মাকে ও দেখত।

তারপরই মনটা বদলে গেল শানুর। ভাবল, আহা কী করবে—ওই রকমই মা ওর, তবু মা তো।

ওর মামারা ভাত শেষ করে পাতাগুলো তুলে চাটতে লাগল, তারপর উঠে চলে গেল। তারা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিংলাইয়ের মা ছেলের পাতে চারটি ভাত দিয়ে দিল।

এতক্ষণে রহস্য ধরা পড়ল।

ওই পাজী মামাগুলোর ভয়েই ছেলেকে একটু ভাতও দিতে

পারে না ওর মা বেচারা! হঠাৎ ওই ময়লা কাপড় পরা বিচ্ছিরি মাকেও ভাল লাগল শান্তুর। মায়া হ'ল তার ওপর। ডিংলাইকে আর তার মাকেও যদি নিয়ে যেতে পারত শান্তু! সেখানে অবিশ্যি ডিংলাই বলবে না 'নারায়ণচন্দ্র' বলবে।

কিন্তু কোথায় কি?

পালাতে গেলেও তো ধরে ফেলবে এরা।

'ঘর ভেঙে ফেলছে কেনরে?'—জিজ্ঞেস করল শান্তু।

ডিংলাই বলল, 'এখান থেকে চলে যাবে বলে।'

'চলে যাবে? এখন?'

'হ্যাঁ ধূপকালে আঁধারেই হাঁটতে হয়। নইলে সূর্যিঠাকুর পা পুড়িয়ে দেয়!'

'ঘর ভেঙে নিয়ে চলে যাবে?'

'যাবে না? না ভাঙলে—'

কি ভেবে ডিংলাই আশ্চর্যভরে বলে, 'ঘর পড়ে থাকলে মন্দ দেবতারা এসে বাসা করবে না?

'আমি যাব না তোদের সঙ্গে।' দৃপ্তভাবে বলে শান্তু।

এত ভয়ের মধ্যে সাহসটা হারায় না ও।

'না গেলে মারবে।' ডিংলাই বলে, 'ওরা বলছে, তোকে আমার মতন ট্যানা পরিয়ে নিয়ে যাবে।'

'কী পরিয়ে?' তীক্ষ্ণ চীৎকার করে ওঠে শান্তু।

'চুপ চুপ! শুনলে আমায় মারবে। ট্যানা, এই যে আমার মতন।' নিজের পরণের নেংটিটুকু দেখায় ডিংলাই।

'কক্ষনো না! আমি মরে যাব। সমুদ্দুরে ডুবে যাব। আমি এইখানে বসে থাকব।'

ডিংলাই ম্লানভাবে বলে 'এই, তুই ওদের সঙ্গে পারবি না। ওই ছোট মামাটা ভারী মন্দ আছে। মারবে। এখন কিছু বলবি না। যা বলে শুনে নে। তোকে আমি পালিয়ে দেব। হক বলছি, দেব।

তোকে রাজার বেটার সাজ করে মামারা সাথে নেবে না। তাদের পুলিশে ধরবে। ছেলে চোর বলবে।'

হঠাৎ চুপ করে যায় ডিংলাই। তার বড় মামা এসে দাঁড়ায় ময়লা একটুকরো ন্যাকড়া হাতে নিয়ে।

ছয়

ডুগ ডুগ—ডুম ডুম, ডুগ ডুগ—ডুম ডুম।

বাজছে ডুগডুগি—বোল কেটে কেটে।

তার সঙ্গে বোল কাটছে—ভালুকওয়ালা নিজে। 'দেখো বাবু খেল দেখো। জাহাঙ্গীর কা খেল দেখো।'

'জাহাঙ্গীর আর নূরজাহান' ভালুক আর ভালুকনি। ওদের নিয়ে যত মজাদার কথা।

ওরা সম্রাট হয়ে দিল্লীর মসনদে বসছে। আবার জ্বর হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুচ্ছে। জ্বরের জন্যে ডাগদার আসছে, নানা কথার ফুলঝুরি ঝরাচ্ছে ভালুকওয়ালা।

ডুগডুগির বোলে আর ভালুকওয়ালার বোলচালে মেলাতলার একটা দিক জমজমাট সরগরম। রাজ্যের ছেলেমেয়ে এসে ঝুঁকে পড়েছে সেখানে।

এই ভীড়ের মধ্যে শাম্বু আছে ডিংলাই আছে। ওরা এসেছে এই কাঁথির মেলায়। মানে ওদের দলই এসেছে—ডিংলাইয়ের মা, দিদিমা, মামারা। ঘর ভেঙে তুলে নিয়ে এমনিই বেরিয়ে পড়ে ওরা মেদিনীপুর জেলার এখানে সেখানে। মাঝে মাঝে আসে মেলাতলায়।

না আছে ক্যালেণ্ডার, না আছে পাঁজিপুঁথি, তবু ওরা ঠিক বুঝতে পারে কোন ঋতু কোন মাস, আর মুখস্থ আছে ওদের কোথায় কোথায় কবে কবে মেলা বসে।

মেলায় অবিশ্যি ওরা কিছু বেচতেও আসে না, কিনতেও আসে না। আসে আসলে কনে খুঁজতে। হ্যাঁ কনে খোঁজার জন্যেই ওদের মেলায় আসা!

তা হাসবার কি আছে বাপু? ওদের কি আত্মীয় সমাজ আছে যে, অন্য আর একজনের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এসে, কি বেড়াতে এসে, কার বাড়ীতে ছেলেমেয়ে আছে তার সন্ধান হবে? না কি ওদের খবরের কাগজই আছে যে, 'পাত্র-পাত্রী'র বিজ্ঞাপন দেখবে?

মেলাতলার মত জায়গাই ওদের ভরসা। মেলার আশেপাশে কোনও চালার ছাঁচতলায় চট বিছিয়ে পড়ে থাকে। উঞ্ছবৃত্তি করে খায়, আর কনে খোঁজে।

মানে ওদেরই মত আরও 'কাকমারা'র দল তো আসে অন্য কোথাও থেকে। তাই থেকেই বেছে গুছে নেওয়া।

ডিংলাইয়ের দিদিমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে যে এবার ছেলেদের বিয়ে দেয়, কিন্তু মেয়ে পাচ্ছে না। এবার তাই কাঁথির এই বড় মেলায় এসে হাজির হয়েছে।

শাম্বুকেও ওরা এনেছে, কড়া নজরবন্দীতে রেখেছে!

ডিংলাইয়ের দিদিমার আগের মতলব আর নেই। মানে পুলিশের কাছে 'হারানো ছেলে' জমা দিয়ে টাকা সংগ্রহের

মতলবটা। এখন ওর ইচ্ছে ছেলেটাকে 'মানুষ' করবে। তাই এত পাহারা।

অবিশ্যি নিজেদের সেই ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরোটুকু পরিয়ে ফেলতে পারে নি শানুকে ওরা। শানু চেঁচিয়ে লাফিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে এমন কাণ্ড করেছিল যে, ওরা ভরা পেয়ে গেল ছেলেটা পাছে মরে যায়।

নিজের জামাতেই আছে শানু। যদিও সেটা একেবারে ময়লা বিচ্ছিরি হয়ে গেছে, তা' আর কি করা? কাবলীওয়ালারা তো যে পোষাকটা পরে, সেটা না ছেঁড়া পর্য্যন্ত আর একটা কেনে না। শানু বরং কাবলীওয়ালা হবে, তবু ওই কাকমারা হবে না।

ভালুক নাচ হচ্ছে, ডিংলাইয়ের মামা-দিদিমাদের তা'তে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা তখন আর এক কাকমারার দলের সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত। কারণ দু'দুটো বড়সড় মেয়ে আছে ওদের। অতএব আশা হচ্ছে, ডিংলাইয়ের দু'দুটো মামার একসঙ্গে 'হিল্লে' হয়ে যাবে।

বিয়ে অবিশ্যি নিঃখরচায় হবে না, কনের বাবাকে একখানা নতুন কাপড় দিতে হবে, আর কনেকে একখানা নতুন শাড়ী। দুটো ছেলের বিয়ে দেওয়া মানেই চারখানা নতুন কাপড় যোগাড় করা!

সোজা কথা নয়!

ভরসা শুধু একটু হাত সাফাইয়ের। মেলার বাজারে ধুতি-শাড়ীর দোকান তো কম খোলেনি, আর বাহার দিয়ে ঝুলিয়েও রেখেছে রাস্তার ওপর।

ডিংলাইয়ের দিদিমা ছেলেদের জানিয়েছে সবাই মিলে চেষ্টা দেখতে। অনেক ভীড়ের মধ্যে থেকে ঝপ্ করে একখানা সরিয়ে ফেলতে পারলেই ব্যস্, বিয়ে একটু এগিয়ে যায়।

তা ডিংলাইয়ের দিদিমা কনে দেখার আর ছেলেদের ধুতি শাড় দেখার কাজে লাগিয়ে ঘুরছে। শানু আর ডিংলাই কোথায় কি করছে অতটা খেয়াল নেই। ইত্যবসরে এরা চলে এসেছে ভালুক নাচে।

ভালুকের সঙ্গে সঙ্গে ডিংলাইও নাচছে থুম থুম থুম থুম। আর তার মুখে চোখে স্ফূর্তিটা যা ফুটে উঠেছে তা দেখবার মত।

কিন্তু শানু তখন আর এক চিন্তায় বিভোর। ও ভাবছে এই ভীড় আর গোলমালের মধ্যে যদি পালাতে পারত! হ্যাঁ, একপাশে সরতে সরতে এর ওর তার পিছন দিয়ে কোন প্রকারে একবার যদি কোনও পাশ দিয়ে মেলাতলার বাইরে চলে যাওয়া যায়!

কিন্তু কোন পাশ দিয়ে?

ডিংলাইয়ের মামারা আর মা-দিদিমা কোন দিকটায় যে তাদের ছেঁড়া চট বিছিয়ে রাজ্যস্থাপন করেছে, তা' তো ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। এই মেলাতলার সবই যেন কেমন গোলমেলে। শানু তো এই তিন দিন ঘুরছে এদের সঙ্গে, বুঝতেই পারছে না কোনটার পর কোনটা।

এই তো এখানটায় সাইকেলের দোকান, ওদিকটায় ধামা কুলো ঝুড়ি চুপড়ি। তার পাশ দিয়ে কোনখানটায় যে সারি সারি বাসনের দোকান, আর কোন দিকে মাটির পুতুল, কোন দিকে কাঁচের চুড়ি, কোন দিকে প্ল্যাষ্টিকের খেলনা, কোন দিকে বা সেই গাদা গাদা জামা কাপড়ের দোকান, কোন দিকে জ্যাম জেলি, আচার মোরব্বা, পানে খাবার সেই সব জর্দা, মশলা, ধূপকাঠি! জিনিস জিনিস—কত অজস্র জিনিস!

ডিংলাই এসব জিনিসের নাম তবু কিছু কিছু জানে, কিন্তু ওর মা-দিদিমারা তিন ভাগ জিনিস চেনেই না। শানু দেখছে সে সব, আর ডিংলাই এদিক ওদিক ঘুরছে, কিন্তু ওরা কেবল সেই একই জায়গায় ঘুরঘুর করছে।

জায়গাটা?

তা অবিশ্যি শানুরও অপছন্দের নয়, কিন্তু হাতে পয়সা না থাকলে আর পছন্দ হয়েই বা কি হবে!

বুঝতেই পারছো, জায়গাটা হচ্ছে রেষ্টুরেণ্ট আর খাবারের

দোকানের দিক। সে দিকের কাছাকাছি যেতে না যেতে জিলিপি-ভাজার, কচুরি সিঙাড়া ভাজার, পান্তুয়ার রস ফোটার, ঘুগনি সেদ্ধ হবার প্রাণ-আমোদ-করা গন্ধে মাথা টাতা খারাপ হয়ে যায়।

আশ্চর্য্য! এই সমস্ত জিনিস কলকাতায় রাশি রাশি ছিল, আর শান্তুর কাছে কত পয়সা ছিল!

জীবনে যদি কখনো আবার শান্তু বাবা-মার কাছে ফিরতে পারে, তা হলে শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি জিলিপি, বস্তা বস্তা কচুরি, গামলা গামলা পান্তুয়া, থালা থালা দরবেশ আর গজা, বালতি বালতি মিহিদানা—

হঠাৎ চমকে উঠল শান্তু, এ কি! কোথায় ভালুক নাচ? কোথায় ডিংলাই? সত্যিই যে সরতে সরতে শান্তু মেলার বাজার ছাড়িয়ে একেবারে সার্কাস পার্টির তাঁবুর পেছনে এসে গেছে!

এই তাঁবুর মধ্যে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে বাইরের কারুর দেখার জো নেই। আলাদা পয়সা দিয়ে ওর মধ্যে ঢুকতে হয়। দলে দলে ঢুকছেও। শান্তু সেদিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়াল।

উঃ এত লোক ঢুকছে ওর মধ্যে, ভীড়ে গিসগিস করে ঢুকছে, অথচ ছোট একটা ছেলে যদি নেহাৎই নিজের কাছে পয়সা নেই বলে ওদের মধ্যে গুঁজে গিয়ে ঢুকে পড়তে চায়, ঠিক বুঝতে পারবে ওরা!

কি করেই বা পারে?

অথচ পারে, দেখেছে ও আর ডিংলাই। মোটা হাতীর মত ছুটো লোকের পিছন পিছন ঢুকে পড়তে গিয়ে দেখেছে কাল, খপ করে ধরে ফেলেছে ওদের। 'হঠ্ যা হঠ যা,' করে ভাগিয়ে দিয়েছে!

আবার একটা লোক বলেছে, 'উঃ এইটুকু ছেলে—এক্ষুণি থেকে ফাঁকিবাজ আর চোর হয়ে উঠেছে! বড় হয়ে নির্ঘাত গাঁটকাটা হবে।'

শানু যে কে, তা' যদি ওরা জানত!

কিন্তু সে যাক, ভয় ওই মানুষের চোখকে! শানুর মত ছোট্ট একটা ছেলেও পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবে কি না সন্দেহ। হয়তো যেই সে এই তাঁবুর পিছনের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ওই পুকুরটার ধার দিয়ে রাস্তার দিকে চলতে সুরু করবে, হয়তো ঠিক দেখবে ডিংলাইয়ের দুই মামার চারখানা চোখ গুলিভাঁটার মত এগিয়ে আসছে!

ডিংলাই আবার বলে কি না, শানুকে ওদের ভাল লেগেছে, তাই পুষবে। শানু, গরু কুকুর না পাখী যে তাই পুষবে? পুষলেই হ'ল! মজা পেয়েছে! শানু যখন—

উঃ!

কাঁটাতারের ঘসটানি লেগে হাঁটুর ছাল ছিঁড়ে গেল!

কখন যে শানু বেড়া ডিঙিয়ে মেলাতলার বাইরে এসে পড়েছে নিজেই জানে না। হাঁটুর জ্বালায় খেয়াল হ'ল।

কেটে গেলে তক্ষুণি ডেটল লাগাতে হয় শানু জানে, কিন্তু এখানে কোথায় কি? হাত দিয়ে চেপে ধরেই শানু একবার ভয়ানক ভয় পাওয়া আর ভয় ছাড়ার একটা নিশ্বাস নিল।

ডিংলাইকে কিছু বলে আসা হ'ল না।

ডিংলাই কি এখুনি শানুকে খুঁজতে সুরু করেছে? না থুম-থুমা-থুম নাচ দেখছে এখনো?

ও কি শানুকে ভালবেসে খুঁজবে?

না কি মামাদের ধমকে—

দাঁড়িয়ে থাকায় যে বিপদ আছে, একথা ভুলে গেল শানু। সে ভাবতে লাগল ডিংলাই একসময় হঠাৎ তাকে দেখতে না পেয়ে কী করবে?

পাগলের মতন ছুটোছুটি করবে?

'শানু শানু' করে চীৎকার করে আকাশ ফাটাবে? না কি ভাববে—ভালই হয়েছে শানুটা পালিয়ে যেতে পেরেছে।

কিন্তু শানুকে কী নিষ্ঠুরই ভাববে ডিংলাই। ওকে একবার না বলে চলে আসা খুব অন্যায় হয়েছে।

আর একবার কি ওইখানে গিয়ে বলে আসবে শানু—'ডিংলাই আমি পালাচ্ছি!'

কাঁটাতারের জ্বালাটা যন্ত্রণা দিচ্ছে।

আর সেই ওর মামাদের ভাঁটা চক্ষুর কাঁটা।

নাঃ বলে যাওয়া অ হবে না।

জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না ডিংলাইয়ের সঙ্গে!

নিশ্বাস ফেলে ভাবল শানু।

কালো কোলাব্যাঙের মত দেখতে, নেংটিপরা কাকমারাদের ছেলেটার জন্যে শানুর মনটা উদাস হয়ে উঠল।

তারপর ভাবল যদি কখনো দেখা হয় ডিংলাইয়ের সঙ্গে, অনেক অনেক জিনিস দেবে তাকে! আদর করে বাড়ীতে নিয়ে এসে মাকে দেখিয়ে বলবে, এই দেখ, আমার সেই বুনো বন্ধুটি!

শানুর চোখটা জলে ভরে এল।

তারপর হঠাৎ চৈতন্য হ'ল এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়।

আস্তে আস্তে এগোতে লাগল শানু পুকুরপাড়ের সরু একটা পায়ে-চলা রাস্তা দিয়ে।

এদিকটা নির্জন নিস্তব্ধ।

বোধহয় গ্রামের মেয়েরা কদাচই এ পুকুরে জল নিতে আসে। পায়ে-চলা রাস্তায় ঘাস জন্মে গেছে মাঝে মাঝে।

মেলাতলার যে সমস্ত শব্দ-মিশ্রিত একটা রোল অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনা যায়, আস্তে আস্তে কমে আসছে সেটা—ক্ষীণ হয়ে আসছে।

পথের দুপাশের গাছ থেকে একটা সির-সির শব্দ উঠছে।

দূরে কোথায় যেন কুকুর ডাকছে।

দিনদুপুরটাই রাতদুপুরের মত গা-ছমছমে কেমন কেমন!

শানু কোথায় চলেছে?

ভাবতে থাকে শানু—এ কোন দেশ, কোন জেলা, কোন গ্রাম?

একটা পোষ্টকার্ড যদি পায় শানু আর একটা পেনসিল, মাকে তো চিঠি লিখে দিতে পারে, 'মা আমি হারিয়ে গিয়েও বেঁচে আছি। আমাকে তোমরা নিয়ে যাও।'

কিন্তু কোথায় আসবে মা বাবা?

হারিয়ে যাওয়া শানু নিজের ঠিকানা কার কাছে পাবে?

'পাওয়া গেছে। সন্ধান একটা পাওয়া গেছে।' পুলিশ অফিসার বলেন শানুর বাবাকে। 'দীঘার ওই দিক থেকে কাঁথির কি একটা গ্রামের মেলাতলার দিকে যেতে দেখেছে কেউ কেউ একদল বেদে ক্লাশের লোককে—যাদের পেশা হচ্ছে পাখীমারা, কাকমারা, মানে একেবারে 'লো' ক্লাশ আর কি! তাদের সঙ্গে নাকি একটি ওই বয়সের ভদ্রঘরের ছেলেকে দেখা গেছে—'

শানুর মা চীৎকার করে ওঠেন—

'তা' চলুন কাঁথি!'

'আহা ধৈর্য্য ধরুন, শুনুন। যারা দেখেছে তারা এমন কিছু রেসপেক্‌টেব্‌ল নয়। কি দেখতে কি দেখেছে হয় তো—'

'আপনি তো বলছেন ভদ্রঘরের ছেলেকে দেখেছে—' শানুর মা কাঁদতে থাকেন, 'ওরা ওই বেদেরা তেমন ছেলে কোথায় পাবে?'

'ঠিক কথা! সেটাই এখন আমাদের সন্ধানের বিষয়—'

'আমি জানি না। আমি যাব কাঁথি!' শানুর মা জোরে জোরে বলেন, 'কেন আপনারা আমাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়?'

শানুর বাবা ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'আঃ কী হচ্ছে? ওঁরা কি করবেন? খোঁজা তো চলছে—'

'না না, ওঁদের খোঁজায় কিচ্ছু হবে না। আমি নিজে যাব। নিজে খুঁজব। আমি এক্ষুণি কাঁথির সেই মেলায় যাব!'

অস্থির হয়ে ওঠেন শানুর মা।

অনেক কষ্টে ভোলাবার চেষ্টা করা হয় তাঁকে, কিন্তু তিনি প্রায় পাগল। শেষ অবধি তাঁকে নিয়ে আবার রওনা হতে হয় শানুর বাবাকে কাঁথির মেলার উদ্দেশে।

আবার চাবি পড়ে বাড়ীতে।

শানুর বাবার কাজকর্ম?

সে তো মাথায় উঠেছে।

ক'দিন পরে আবার ওঁরা ফিরে আসেন বিফল মনোরথ হয়ে।

মেলাতলায় যত ওই ধরনের লোক জড় হয়েছিল কেউই স্বীকার করতে চায় না যে তাদের সঙ্গে কোনও ভদ্দরলোকের ছেলে ছিল।

শুধু একটা শুকনো মুখ কালো কিষ্টি ছেলে মেলার বাইরে ঘুরছিল। সে ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে হাত-মুখ নেড়ে কোনও রকমে বোঝালে একটা ভদ্দরলোকের হারানো ছেলে তাদের দলে ছিল, কিন্তু সে আবার হারিয়ে গেছে।

কোথায় চলে গেছে কে জানে!

বাড়ী ফিরে শানুর বাবা বাইরের দিকের ঘরটার দরজা খুলেই থমকে দাঁড়ালেন।

একটা জানালার খড়খড়ি খোলা, সেখান দিয়ে বৃষ্টির জল এসেছে গড়িয়ে, আর সেই জলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা পোষ্টকার্ড। ভিজে থসথস করছে।

বাড়ীর দরজা বন্ধ দেখে পিয়নে জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে

পোষ্টকার্ডখানা। তারপর কখন বৃষ্টি এসেছে জোরে আর জল এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। সব লেখা গুলো ধেবড়ে ঝাপসা হয়ে গেছে!

কিন্তু কার চিঠি এ?

বড় বড় অক্ষর, ছাড়া ছাড়া লাইন, ছোট ছেলেদের হাতের লেখার মত!

শানুর বাবার হাত-পা কাঁপতে থাকে, পোষ্টকার্ডখানা হাতে নিয়েবসে পড়ে চীৎকার করে ওঠেন শানুর বাবা—'এই শুনছো—শীগগির এসে দেখে যাও এ কার চিঠি!'

কিন্তু কি দেখবেন শানুর মা? তাতে কি দেখবার কিছু আছে? সব তো ভিজে গেছে।

সাত

হায় শানু কি একবারও ভেবেছিল তার অত কষ্ট করে যোগাড় করা পোষ্টকার্ডটার এই দুর্দশা হবে? ও শুধু দিন গুনছে। চিঠি যেতে ক'দিন লাগে, চিঠি পেয়ে চলে আসতে ক'দিন লাগে? একদিন একদিন দু'দিন এই তো। কিন্তু এ যে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, আর চায়ের দোকানের হেড চাকরটা তাকে রাত-দিন খিঁচোচ্ছে।

. হ্যাঁ, আপাতত শাম্বুর বাসস্থান একটা চায়ের দোকান। খড়্গপুর ষ্টেশনের ধারের এই দোকানটার মালিক সাধন কুণ্ডু বলে 'আমার দোকানের চা যে খাবে, তার আর বয়েস বাড়বে না। বুঝলেন মশাই, যে বয়সের আছেন সেই বয়সেই থাকবেন।'

আর ওদিকে হেড চাকর কানাইকে বলে, 'একবার চা বানিয়েই ভিজে পাতাগুলো ফেলে দিসনে বাপ কানাই, রোদে মেলে দিয়ে শুকিয়ে নে, আর একদিন চলবে। একটু বেশী করে ফুটিয়ে নিবি।' নয় তো বলে, 'সর্বনাশ করলে, সর্বনাশ করলে! পুরোপুরি চিনি? তোরা কি আমায় ডোবাতে চাস কানাই? আধাআধি গুড় দিয়ে চা বানালে পুষ্টিকর হয়, এ তোকে কত দিন শেখাতে হবে বাপ? চায়ে চিনি দিবি, দুধ দিবি, এত বায়নাক্কা করলে আমার দোকানে পোষাবে না বাপ! পথ দেখ, পথ দেখ।'

এই সাধন কুণ্ডুই স্টেশনের ধারে কাছে ঘুরে বেড়ানো ছেলেটাকে ধরে এনেছিল। বলেছিল, 'কলকাতায় যাবি? তা বেশ তো? কিন্তু যেতে হলে তো পয়সা লাগে? রোজগার কর সে পয়সা। আমার দোকানে কাজ কর।'

শাম্বু তো শুনে আগুন।

'কাজ করব মানে? আমি কি চাকর?'

'আহা-হা চাকর কিসের চাঁদ, তুমি নয় মালিকই হলে! হুঁঃ! বলি বাড়ী থেকে তো পালিয়ে এসেছিস, আর পুলিশে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, জানি না ভেবেছিস?'

আসলে অবশ্য এটা সাধন কুণ্ডুর চালাকি। আন্দাজেই বলেছে। দেখেছে ভদ্রঘরের ছেলের মত চেহারা, অথচ রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ স্রেফ ঘর-পালানো ছেলে। অতএব ভয় দেখিয়ে কবলে আনতে হবে।

আর পুলিশের ভয়ের মত ভয় আর কিসে আছে?

শান্তু কিন্তু রেগে আগুন। বলে, 'ইঃ পুলিশ আমায় ধরবে কেন? আমি কি চোর? আমি তো শুধু হারিয়ে গেছি।'

'আহা তা বেশ তো। হারিয়ে গেছিস, এবার নিজেকে খুঁজে নে। আমার দোকানে কাজকর্ম কর, আমার কাছে খা, পর, থাক। দেখবি দিব্যি নিজেকে খুঁজে পেয়ে যাবি।'

তা 'খাওয়া' শুনে শান্তুর মনটা নরম হল একটু। দু দিন তো খাওয়া দাওয়া বন্ধ। আর শুধুই কি দু'দিন? ডিংলাইদের ওখানে কিই বা খেয়েছে এতদিন?

আর পরা?

সেও একটা কিছু পেলে ভাল হয়। গায়ের জামা-প্যান্টটা তো গায়ের চামড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে!

তাই গম্ভীরভাবে শান্তু বলে, 'বেশ খেতে পরতে পারি, কিন্তু কাজ টাজ করতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।'

শুনে সাধন কুণ্ডু এ্যায়সা হাসি হাসতে লাগল যে, শান্তু তো 'হাঁ'। এদিকে সাধন কুণ্ডুর হাসির হাঁ আর বোজে না। আর যদি বা বুজল তো সুরু হল কথার তুবড়ি।

'খেতে পারবি? পরতে পারবি? ওরে আমার সোনার চাঁদ রে, পারবি আমার তিন পুরুষের মাথা কিনতে? কিন্তু তোকে আমি অমনি খাওয়াব কেন রে? কী তুই আমার গুরুপুত্তুর!'

শান্তু রেগে গিয়ে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'ছেড়ে দাও, আমি যাব না তোমার সঙ্গে।'

'যাবি না? হাঃ হাঃ হাঃ! তবে পুলিশের হাতে যা। চল নিয়েই যাই থানায়!'

'থানা' শুনেই শান্তুর কেমন ভয় ভয় করে। তবু মুখে তো হারবে না সে। তাই বুক ফুলিয়ে বলে, 'বেশ চল না! থানায় যেতে ভয়টা কি আমার? আমি তো আর দোষ করি নি!'

'না দোষ করিস নি!' সাধন কুণ্ডু খিঁচিয়ে ওঠে 'বড় গুণ

করেছিস! মা-বাপের মনে কষ্ট দিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিস।'

এক হ্যাঁচকা টান মারে সাধন। শানুর চোখে জল আসে, গলা বুজে আসে। ভাবে সত্যিই তো আমি কী কম পাজী? কিন্তু এত কাণ্ড হবে, তা কি জানত শানু, যখন সেই দীঘার বাসা থেকে 'একটুখানি' শুধু বেরিয়েছিল?

সাধন কুণ্ডু গিয়ে কানাইকে ডাক দেয় 'এই নে। দোকানের জন্যে একটা এ্যাসিসটেণ্ট চাইছিলি। এনে দিলাম এ্যাসিসটেণ্ট। চায়ের বাসনপত্তর ধুতে দিস নি। ভেঙে চুর করবে। শুধু টেবিল মোছা, ঘর ঝাড়া এই সব করাবি। আর শোন, এই নে তিনটে টাকা নে। অনন্ত নন্দীর দোকান থেকে একটা হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি কিনে নিয়ে আয়।'

অতঃপর সেই তিন টাকার গেঞ্জি-প্যাণ্ট পরিয়ে শানুকে কাজে বহাল করিয়ে নেয় সাধন কুণ্ডু।

কিন্তু কাজ শানু পারলে তো?

কানাই আর সাধন একসঙ্গে খিঁচোতে থাকে, 'ওরে আমার নবাবপুত্তুর, বসে বসে খাবে তুমি? কী আমার সগগে বাতি পড়বে তোকে খাইয়ে?'

শানুর চলে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারে না।

কানাইয়ের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে একটা পোষ্টকার্ড যোগাড়ের আশায় এত কষ্ট করে পড়ে আছে শানু।

অবশেষে একদিন সে আশা সফল হল। দেখল কানাই একটা পোষ্টকার্ড নিয়ে চিঠি লিখছে। আহ্লাদে চোখ জ্বলে উঠল শানুর। বলল, 'আমায় একটা পোষ্টকার্ড দেবে?'

কানাই খিঁচিয়ে উঠে বলল, 'পোষ্টকার্ড? সে আবার তুই কি করবি?'

'চিঠি লিখব।'

'ওব্ বাবা! বলি তুই লিখতে জানিস?'

'জানি না মানে? আমি ইস্কুলে পড়ি না বুঝি?'

'ও বাবা! তাই নাকি? দেখি তো কেমন লিখতে পারিস!' বলে পকেট থেকে একটা পোষ্টকার্ড দেয় কানাই। দোয়াত-কলমটাও এগিয়ে দেয়।

কলমে হাত দিয়ে শান্তুর হাত কাঁপতে থাকে, 'মা' লিখতে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে, তবু লিখেও ফেলে শেষ পর্য্যন্ত। ঠিকানাও লেখে। আর ভাবে শুধু এই একখানি পোষ্টকার্ডের অভাবে এত কষ্ট করে পড়ে আছে শান্তু, এতদিন এত কষ্ট পেয়েছে।

পোষ্টকার্ডটার মাথায় এখানের ঠিকানা লেখে শান্তু বড় বড় করে। সে ঠিকানা সে সাধন কুণ্ডুর চায়ের দোকানের সাইন-বোর্ড থেকে সংগ্রহ করেছে:

ওরিয়েন্টাল রেষ্টুরেন্ট,
স্টেশন রোড, খড়্গপুর
প্রোঃ শ্রীসাধনচন্দ্র কুণ্ডু।

কুণ্ডু শুনলেই শান্তুর ইচ্ছে করে ওর মুণ্ডুটা ধরে ঘুর্‌র্ করে লাট্টুর মত ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু সে ইচ্ছে তো আর মেটে না। তবে এবার ঘুরে যাবে মাথা। যখন চিঠি পেয়ে শান্তুর মা আর বাবা আসবেন সুন্দর জামাকাপড় পরে, আর এত এত টাকা নিয়ে আসবেন, তখন ওই সাধনটা নিশ্চয় ভাববে, 'হায় হায় এ কী করেছি! কাকে দিয়ে আমি টেবিল মোছাতে গিয়েছি! কাকে আমি এত বকেছি!'

মাথা ঘুরে যাবে তখন সাধনের।

কিন্তু সে চিঠির কী অবস্থা হল, সে তো আগেই বলেছি।

শান্তু দিনের পর দিন ভাবতে থাকে, ওই বাবা আসছেন, ওই মা আসছেন। রাস্তায় একটা গাড়ীর শব্দ হলেই যেখানে থাকে ছুটে আসে।

কিন্তু কোথায় মা? কোথায় বাবা?

তাঁরা তো তখন সেই জল পড়ে অক্ষর মুছে যাওয়া চিঠিটা নিয়ে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছেন, যদি কেউ পড়ে উদ্ধার করে দিতে পারে।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস, জোরালো আলো, রাসায়নিক পরীক্ষা কিছুতেই কিছু হল না। যে লেখা মুছে গেছে, সে লেখা কি আর পড়া যায়?

শান্তুর মামার বাড়ী সবাই একে একে দেখতে থাকে।

সকলেরই ধারণা কেউ পারেনি বটে, কিন্তু আমি পারব। কিন্তু চিঠিটা হাতে নিয়ে সবাই হেরে যায়।

অবশেষে শান্তুর ছোটমামী আবিষ্কার করেন, এর ডাকের ছাপে একটা 'পি' আছে।

কিন্তু শুধু 'পি'তে কী হবে?

'পি' দিয়ে কত নাম!

আর 'পি'টা যে নামের ঠিক কোথায় আছে, তাও তো জানা নেই? আগেও থাকতে পারে, শেষেও থাকতে পারে, মাঝেও থাকতে পারে।

তবু টাইম টেবল, ব্রাডশ, ভারতবর্ষীয় পোষ্টাফিস সমূহ নিয়ে পড়া হল। কোন কোন দেশে আছে 'পি'।

ওরে বাবা ক'টা দেশ গুণবে?

'পি' দেখতে দেখতে মাথা ঝিমিয়ে আসে। এত দেশে কি খোঁজা যায়?

শান্তুর দিদিমা বলেন, 'থানা পুলিশ, খবর কাগজ, ওসব কোন কর্মের নয়। খোঁজ যদি কেউ দিতে পারে তো গণৎকার। গণৎকারেরাই গুণে বলতে পারে হারানো জিনিস কে নিয়েছে, হারানো ছেলে কোথায় আছে।'

তা' গণৎকারের কাছে কি আর যাননি শান্তুর মা-বাবা? কত

গিয়েছেন। কিন্তু আসলে তো বেশীর ভাগই ভণ্ড, আর সাজা গণৎকার। খালি পয়সা নিতেই ওস্তাদ।

তবু আশা নিয়েই তো বাঁচা!

কে নাকি বলেছে শান্তুর দিদিমাকে—বেহালার ওদিকে কী না কি 'জানবাড়ী' আছে, সেখানের গণৎকার সব জানিয়ে দেন। আর সবচেয়ে ভাল কথা হচ্ছে—পয়সা টয়সা কিছু নেন না তিনি।

তবে?

তা' হলেই তো!

পয়সা নেন না মানেই আসল খাঁটি! শুধু পরোপকারের তরে 'বাড়ী'র দরজা খুলে বসে আছেন।

শান্তুর দিদিমা বললেন, 'পাঁচটি সুপুরি, একটি পৈতে—ব্যস।'

ট্যাক্সী চড়ে চললেন শান্তুর মা বাবা দিদিমা ছোটমামা।

শান্তুর মা ভাবছেন এইবার পেয়েছি, এইবার শান্তু আমার কাছে আসবে।

তা' গণৎকারটি ভাল।

বললেন, 'ওই সুপুরি ক'টি রেখে যান, ও আমি ছোঁব না। দক্ষিণা আমি ছুঁই না। তবে একটা নিয়ম আছে—'

'কী!'

'আর কিছু না, একখানি নতুন গরদের ধুতি পাট করে তার ওপর বসে গণনা করতে হয়।'

শান্তুর বাবা বলেন, 'এই কথা! এক্ষুণি আনছি।'

ট্যাক্সী করে আনতে যান।

গণৎকার বলেন, 'আর একটি নিয়ম—'

'কী বলুন?'

'বড় টিনের একটিন ভাল খাঁটি ঘী! আগামী কাল গভীর রাত্রে হোম করতে হবে।'

'ঠিক আছে।'—বলেন শান্তুর বাবা।

বিনা দক্ষিণায় যিনি গণনা করছেন, তিনি যা বলবেন করতে হবে বৈ কি! মাত্র পাঁচটি সুপুরি নিয়ে এত বড় কাজ! তা-ও সে সুপুরি হাত দিয়ে ছোঁন না!

শান্তুর বাবা বললেন, 'এক্ষুণি যাচ্ছি।'

'আর শোনো বাবা, সের আড়াই কাশীর চিনি। ওটা হোমে লাগবে।'

'ঠিক আছে।'

'ওহো হো, রোসো—রোসো। পাঁচটি উৎকৃষ্ট ফল।'

আরো অনেকবার, 'আরে শোনো শোনো'—শুনে শেষ অবধি গেলেন শান্তুর বাবা।

গণৎকার জিগ্যেস বাদ করতে লাগলেন—'কত বড় ছেলে, কী করে, কবে হারিয়েছে।' আর তারপর কী আশ্চর্য্যের কথা—চোখ বুজে থাকতে থাকতেই হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ছেলেটি এখন রেলগাড়ী চড়ে কোথাও যাচ্ছে—'

'এঁ্যা রেলগাড়ী চড়ে! যাচ্ছে!'

শান্তুর মা চীৎকার করে ওঠেন, 'যাচ্ছে—না আসছে?'

'রোসো।'

আর একবার চোখ বুজে গণৎকার বলেন, 'বোধ হয় আসছে। দেখলাম···ট্রেনে চড়া, পাশে অন্য একটি লোক। কি যেন কথা বলছে তারা।

'এও দেখতে পান আপনি?'—বলে ওঠেন শান্তুর মা।

'পাই বৈ কি! কোন্ দিকে মুখ করে বসে আছে তা'ও দেখতে পাচ্ছি!'

'ঠাকুর মশাই, তাকে আনিয়ে দিন।'

'আসবে আসবে।' গণৎকার বলেন, 'আমি বলে দিয়েছি। আসতে তাকে হবেই। শুধু একটু দেরী হবে।'

'দেরী! আর কত দেরী হবে?'

'তা' হবে ছ ছ'মাস।' গণৎকার অম্লানবদনে বলেন—'এক বছরও হতে পারে।'

'ও বাবা, তা হলে আমি কি করে থাকব গো।'

শান্তুর মা কান্না জুড়ে দিলেন।

গণৎকার বলেন, 'কাঁদলে কি হবে। ছেলে পড়েছে বদলোকের পাল্লায়। সে ওকে যা বলছে, তাই করছে। এখন একমাত্র উপায় মন্ত্রবলে তাকে আকর্ষণ করা।'

'তা তাই করুন।'

'করব। করতে হবে। কিন্তু কিছু জিনিস চাই যে!

'তা' চান না—'শান্তুর মা বলেন, 'নিজে তো একটু কিছুও নিচ্ছেন না। যা লাগবে, তা নেবেন বৈ কি।'

'আর কিছু না' একখানি নতুন কম্বল। কালো কম্বল হলে চলবে না। ভাল নরম কম্বল লাল, নীল, সবুজ যা হোক।'

তাও এল।

গণৎকার মন্ত্র পড়লেন। চালপড়া ছুঁড়লেন, তারপর বললেন, 'সাত দিনের মধ্যে ছেলে এসে যাবে।'

'সা—ত দিন!'

শান্তুর মা বলেন, 'তিন দিনে হয় না?'

গণৎকার হাসেন, বলেন, 'পাগলী বেটী! তাই কি হয়? এই মন্ত্রের-আলো আকাশে উঠবে। তারপর পথ খুঁজে খুঁজে দেখে ঠিক জায়গায় নামবে। তারপর তার মনে যন্ত্রণা ধরাবে।'

'যন্ত্রণা ধরাবে? সে কি?'

'আহা ধরাবে না? তার মনে সর্বদা এই হতে থাকবে মা-বাপ ছেড়ে কোথায় বসে আছি। তবে না ছুটে আসবে? সেটাই যন্ত্রণা।'

'তা ঠাকুর মশাই, সে কি ইচ্ছে করে আসছে না?'

ঠাকুর মশাই মাথা নেড়ে বলেন, 'না না, তা কেন? তা'হলে তো চিঠি লিখত না। কেউ আসতে দিচ্ছে না। লুকিয়ে চিঠি লিখেছে।

ভগবান তার সুমতি হোক।

'ঠাকুর মশাই, তবে ওই সাতদিনই।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, সাত দিন।' ঠাকুর মশাই আশ্বাস দেন, দেখতে, পাচ্ছি রেলগাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

তা' গণৎকার যেমনই 'খাঁটি' হোন, তাঁর একটা কথা কিন্তু মিথ্যে নয়।

ঠিক সেই সময় রেলগাড়ী চড়েই বেড়াচ্ছিল শান্তু। আর সঙ্গে একজন ছিলও।

কিন্তু সে কি বদলোক?

•

চিঠির উত্তর অথবা মা-বাপের আসার আশায় হতাশ হয়ে, অবশেষে একদিন শান্তু মরিয়া হয়ে উঠে বসেছিল কলকাতায় যাওয়ার ট্রেনে।

না থাক টাকা, না থাক টিকিট—সে এমনিই যাবে। দেখি কে তাকে আটকাতে পারে! এই রেলগাড়ীটায় চড়লেই তো কা ঘণ্টায় কলকাতা যাওয়া যায়। আর শান্তু কিনা এইখানে বসে সাধনবাবুর গালাগাল খাচ্ছে?

যদি তাকে রেলের টিকিট-চেকার ধরে, সে বলবে, 'বেশ তো আমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে চল। দশ ডবল টাকা দিচ্ছি তোমায়।'

তখন যদি জিগ্যেস করে, 'কোথায় তোদের বাড়ী?' শান্তু ঠিকানা বলে দেবে।

বিপদে পড়লেই ভাল। বিপদে পড়তেই চায় শান্তু। বিপদে পড়লেই তাকে পুলিশে ধরবে।

তা' গাড়ীতে বসে একটু যেতে না যেতেই বছর কুড়ির একটা ছেলে ওর কাছে এসে বসে আর হেসে বলে, 'কি রে তুই-ও বুঝি আমার মতন বিনা টিকিটের যাত্রী ?'

শান্তু রাগ-রাগ ভাব দেখিয়ে বলে, 'আমার টিকিট নেই, এ কথা কে বললে তোমায় ?'

'বললে ? বললে তোর মুখ।' হা-হা করে হেসে উঠল ছেলেটা।

আট

ছেলেটার সঙ্গে তক্ষুনি ভাব হয়ে গেল শান্তুর, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে শান্তুর জীবন-কাহিনী শুনে নিল। আর শুনে বলল, 'তোর মা-বাপ কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়নি ?'

'বিজ্ঞাপন ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেয় না কেউ হারিয়ে টারিয়ে গেলে ? জানিস না বুঝি ?'

শান্তু ঘাড় নাড়ে, 'দেখেছি। খবরের কাগজের ভেতরের পাতায় থাকে। হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশে—'

'এই তো জানিস। তা' তুই যদি আদরের ছেলে হবি, তোর বাবা তোর জন্যে বিজ্ঞাপন দেবে না ? খুঁজে দিলে পুরস্কার দেবে না ?'

শান্তু তো হারবে না। তাই সতেজে বলে, 'দেবে না কেন, নিশ্চয় দিয়েছে। আমি কি খবরের কাগজ দেখেছি? যেমন না ডিং-লাইরা, তেমনি হচ্ছে সাধন কুণ্ডু। খবরের কাগজ কেনেই না। কোন ডাক্তারবাবুর ওষুধের দোকানে নাকি কাগজ কেনা হয়, সেখানে যত রাজ্যের লোক গিয়ে পড়ে আসে। আমি তো আর যাইনি।'

সেই ছেলেটার হাতে কিন্তু একটা পাকানো খবরের কাগজ ছিল, সে সেইটাকে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে করতে বলে, 'আচ্ছা ধর যদি দেখিস তোর বাবা তোর জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে?'

শান্তু গম্ভীরভাবে বলে, 'আর দেখে কি হবে? আমি তো নিজেই যাচ্ছি এখন। আরও আগেই চলে যেতাম, শুধু সাধন কুণ্ডু ইষ্টিশান থেকে জোর ধরে নিয়ে গেল বলে—'

'কিন্তু তুই যে বললি, মাকে চিঠি দিয়েছিলি, তা ওরা ওরা নিতে এল না কেন?

শান্তু ঝপ্ করে যেন নিভে যায়। মলিন চোখে তাকিয়ে বলে, 'মা বোধ হয় এখনো দীঘায় পড়ে আছে!'

'তবে সেই দীঘাতেই চিঠি দিলি না কেন?'

'বাঃ! সেখানের ঠিকানা আমি জানি? আর আরও একটা পোস্টকার্ড্ আমাকে কে দেবে শুনি? ওই কানাইকে কত বলে বলে—'

ছেলেটা শান্তুকে খুব নিরীক্ষণ করতে বলে, 'তা বটে।'

তারপর হাতের খবরের কাগজখানার পাক খুলে তাতে চোখ রাখে।

শান্তু একটু চুপ করে জানালায় দিকে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠে, 'তা তোমার কথা তো কিছু জানলাম না। নাম কি, বাড়ী কোথায় ----সব তো বললে না?

ছেলেটা হেসে উঠে বলে, 'তুই কি জিগ্যেস করেছিস ?'

শান্তু অপ্রতিভ হাস্যে বলে, 'এই তো জিগ্যেস করছি। তোমার বাড়ী কোথায়, কোথায় বা যাচ্ছ, নাম কি—'

'হুঁঃ। আমি আবার একটা মানুষ, তার আবার কথা! আমি কি তোর মতন মা-বাপের আদরের ছেলে রে? আমি হচ্ছি একটা সংসারের জঞ্জাল।'

'জঞ্জাল? মানুষ আবার জঞ্জাল হয়?'

'তা' হয় বৈ কি! মা নেই, বাপ নেই, জ্ঞাতি-কাকার বাড়ীতে চাকরের মতন থাকতে হয়। উঠতে বসতে বকুনি, লেখাপড়া শেখাতে খরচ বলে ইস্কুলে দেয়নি—মুখ্যু হয়ে বসে আছি, মনের ঘেন্নায় তাই বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি। নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি।'

'পালিয়ে এসেছ?' ইচ্ছে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছ?

'তবে না তো কি?'

'তা তোমার বাড়ীর লোকেরা—ওই যে বিজ্ঞাপনের ঘোষণা না কি, দেয় নি?'

'আহারে! তা' আর নয়? লাখ টাকা পুরস্কার দেবে! বরং ভাবছে, হতভাগা-মুখপোড়া গেছে বালাই গেছে। আর খেতে পরতে দিতে হবে না।

শান্তু আহত ভাবে বলে, 'যাঃ! তাই আবার কেউ ভাবে না কি? মানুষ বুঝি ভুত?'

'মানুষ ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ সাপ ব্যাং বাঘ সিংহী, সব।' ছেলেটা কাগজটা আবার মুড়ে ফেলে বলে, 'যত বড় হবি বুঝবি।'

'আমি অত সব বুঝতে চাই না। তোমার নাম কি, তাই বল।'

'নাম? নাম বটু! বটুক ভৈরবের দোর-ধরা ছেলে কিনা। তাই এত কপাল-জোর। এই তো বেরিয়েছি, পকেটে নেই একটা পয়সা, দেখি ক'দিন যায়! তারপর না খেয়ে মরব।'

শান্তু ব্যথিত ভাবে বলে, 'তা তুমি তো বড় হয়েছ, চাকরী টাকরী করতে পার না ?'

'চাকরী ? চাকরী কে দিচ্ছে আমায় ? হ্যাঁ দিতে পারে তোর ওই সাধন কুণ্ডুর মতন লোক। তা' তেমন চাকরী করার চাইতে না খেয়ে মরাও ভাল।'

তা' যে ভাল সে কথা শান্তুও বলবে। যা না খিঁচোয় ওরা!

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে শান্তু বলে ওঠে, 'মরে গিয়ে কোনও লাভ নেই। হ্যাঁ যুদ্ধ্টুদ্ধ্ করে মর, সে আলাদা কথা। না হলে বেঁচে থাকাই ভাল। মরে গেলে আর কি হল ? কথাও বলতে পারবে না, হাতও নাড়তে পারবে না, কিছু দেখতেও পাবে না, লোকেরা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে। এ তোমার ভাল লাগে ?'

বটু হেসে ফেলে বলে, 'ভাল কি আর লাগে ? কিন্তু কি উপায় বল ? বাঁচবার জন্যে তো টাকা চাই ? এখন যদি বেশ কিছু টাকা পাই তা'হলে একটা দোকান খুলি। কাঁচের বাসনের দোকান। সুন্দর সুন্দর সব কাঁচের বাসন সাজিয়ে রাখব তাকে তাকে, লোকেরা এসে কিনে নিয়ে যাবে। অনেক লাভ হবে, দেখতে দেখতে বড়লোক হয়ে যাব।'

শান্তু দুঃখিতভাবে বলে বলে, 'কাঁচের দোকান করতে অনেক টাকা লাগে ?'

'তা লাগে!'

'আমার যদি অনেক টাকা থাকত, তোমায় দিতাম।'

'দিতিস! বটু উত্তেজিতভাবে বলে, 'কেন দিতিস ? তুই তো আমার কেউ নয়। তুই তো আমায় চিনিসই না।'

'বাঃ! আগে কেউ ছিলাম না, আগে চিনতাম না, এখন তো তোমার বন্ধু হয়েছি।'

বটু মিনিট খানেক চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'ঠিক বলছিস ?'

'বলেছিই তো। আমার টাকা থাকলে—'

'ইচ্ছে করলেই তুই আমাকে টাকা পাইয়ে দিতে পারিস!'

শানু হেসে ওঠে।

বলে, 'ইচ্ছে করলেই? আচ্ছা—এই চোখ বুজছি, ইচ্ছে করছি।...হে ভগবান, তুমি আমার বন্ধুকে অ—নে—ক টাকা পাইয়ে দাও।'

বটু বলে, 'ধেৎ। চোখ বুজে ভগবানকে ডাকলে যদি টাকার থলি পড়ত, তা'হলে এতদিনে আমি টাকার থলি পেতে শুতাম। কম ডেকেছি ভগবানকে?

'তাহলে কি করে পাওয়া যাবে বল?'

'আছে কৌশল। তুই যদি রাজী হস!'

'কি? কি?' ঝড়াৎ করে গাড়ীটা একটা স্টেশনে থামে।

'বলব। গাড়ীটা আবায় চলুক।'

ইত্যবসরে ষ্টেশনে চা-খাবারের ধূম পড়ে যায়। সকলেই জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চায়ের ভাঁড় নেয়, প্লাটফর্মে নেমে নেমে নিয়ে আসে খাবারের ঠোঙা। সিঙাড়া, পানতুয়া, ইয়া বড় বড় গরম জিলিপি।

শানু আর বটু?

দু'জনেরই পেটের মধ্যে দাবাগ্নি জ্বলছে, কিন্তু পকেট!

নো কানাকড়ি।

একটি নয়া পয়সাও নেই কারুর পকেটে। বটু একটু বোকা বোকা হেসে বলে, 'তোর কাছে কিচ্ছু নেই, না? দু' আনা চার আনা?'

শানু মুখ লাল করে, মাথা নাড়ে।

'আমারও ভাই ট্যাঁক গড়ের মাঠ। লোকেরা বেশ খাচ্ছে, না?'

শানুরও তখন তাই মনে হচ্ছিল। তবু মান-মর্যাদা বজায়

রাখতে জোর করে বলে, 'বেশ আবার কী? ইষ্টিশানের জিনিস বুঝি ভাল? যত সব পচা ঘিয়ে তৈরি। খেলেই তো অসুখ।'

বলে বটে, তবে প্রায় চোখের জল পড়-পড় অবস্থা।

এদের ঘন ঘন তাকানোর বহরে একটা খাবারওলা কাছে সরে আসে; বলে, 'নেবেন নাকি?'

শান্তু বলতে যাচ্ছিল 'না।' কিন্তু বটু হঠাৎ আরো এগিয়ে এসে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'নেবার তো ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নেব আর কি? কি আছে তোমার?'

'আজ্ঞে সবই আছে। কী নেবেন বলুন। সিঙাড়া আছে খাস্তা গজা আছে, রসগোল্লা, পানতোয়া, জিলিপি—'

বটু আর একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, 'আছে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু খাদ্যযোগ্য কি? না কি কেরোসিন তেলে ভাজা?'

অ্যাঁ! কী বলছেন? কেরোসিন তেলে ভাজা! কেরোসিন তেলে খাবার আপনাদের কলকেতায় ভাজতে পারে, আমাদের এদিকে ওসবের চল নেই।

'বটে নাকি? বেশ বেশ বেশ! তাহলে বলছ যে ঘিয়েরই?'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'আজ্ঞে নিশ্চয়। একেবারে বাড়ীতে সরতোলা গাওয়া ঘিয়ে ভাজা।'

'বটে নাকি? তা তোমার জিলিপির কত করে সের?'

'সের? সেরের হিসেব নিয়ে কি হবে? ক' আনা নেবেন তাই বলুন।'

'আরে বাবা ব্যস্ত হচ্ছ কেন—'

'ব্যস্ত হব না? ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। নেবেন কি না তাই বলুন?'

'নেব না কি হে? খিদেয় পেটের নাড়ি পাক দিচ্ছে। একটু মোটা করেই খেতে হবে। দাও আট আনার সিঙাড়া।'

লোকটা আটখানা সিঙাড়া তুলে পাতায় রাখে।

'আচ্ছা তোমার ওই পানতুয়া—কত করে পীস ?'

'চার আনা আছে, দু আনা আছে—'পানতুয়া তুলতে থাকে সে।

'ওই চার আনারই চারটে, আর জিলিপি দুখানা, তোমার গিয়ে রসগোল্লা দুটো—না না চারটেই দাও, খিদেটা জোর পেয়েছে। আর ওই খাস্তা কচুরি দুখানা, নিমকি দুখানা, গজা খান চারেক—'

লোকটা হঠাৎ হাত থামিয়ে বিরক্তকণ্ঠে বলে, 'কী চান পষ্ট করে বলুন না বাবু। একসঙ্গে কত রকম বলছেন ?

'আহা সব রকমই যে খেতে ইচ্ছে করছে। তা দাও দাও না। খেয়ে দেখি ততক্ষণ—'

'আগে পয়সা বার করুন দাদা—' লোকটা কাঁধের গামছাটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, 'গাড়ীতে তো বেল দিয়েছে।'

'দিক না। দিতে দাও। যার যা আছে, সে তা দেবে। তুমি তো দাদা খাবার ছাড়ছ না।'

'আপনিও তো পয়সা ছাড়ছেন না দাদা। নেবেন না তাই বলুন। ট্যাঁকে নেই পয়সা বুঝতেই পারছি। না-হক হয়রাণি।'

গাড়ী নড়ে উঠেছে।

বটু শান্তুর হাতটা চেপে ধরে লাফিয়ে গাড়ীতে উঠে চেঁচিয়ে বলে বলে ওঠে, 'আচ্ছা দেখে নেব তোমায়। খদ্দেরকে খাবার দাও না। আমার যা ইচ্ছে আমি তাই চাইব—'

গাড়ী ছেড়ে দেয়।

অন্য আরোহীরা হাঁ হাঁ করে উঠে বলে, 'কি হল ? কি হল ?'

'দেখুন না মশাই। পাঁচ রকম খাবার চেয়েছি বলে, বলে কিনা, 'যা নেবেন এক রকম নিন। শুনুন তো মশাই। আমি আর আমার এই ভাগ্নে দুজনে তাড়াতাড়িতে না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি। ভাবছি নোনতা মিষ্টি মিশিয়ে পেটটা ভরে খাবো, বাচ্চা ভাগ্নেটা তো যা দেখছে তাই বলছে খাবো। আমি মামা হই,

কোন লজ্জায় 'না' করি? তুই বেচতে এসেছিস খদ্দের যা চাইবে দিবি না?

শানু তো অবাক।

শানু আবার কখন বটুর ভাগ্নে হল? কেন যে বটু অমন আজে বাজে কথা বলল, বুঝতে পারল না শানু, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

গাড়ীর সকলে বলতে লাগল, 'আজকাল ওই ওলা টোলাদের যা অহঙ্কার হয়েছে। যেন এক একটি নবাব খাঞ্জা খাঁ!'

আর হঠাৎ একটি ভদ্রমহিলা দুটো প্লেটে চারখানা করে লুচি আর দুটো করে বড় বড় রসগোল্লা নিয়ে এসে বটুকে বলেন, 'কিছু মনে কোরো না বাবা, খাবার তো কিনতে পেলে না, একটু খাও।

'না না—এ কী! ছি ছি—'

'তাতে কি হয়েছে বাবা? সঙ্গে কচি বাচ্ছা ছেলেটা। আমাদের বেশী রয়েছে—'

শানুর অবশ্য খুবই খেতে ইচ্ছে করছিল। ঠিক মনে হচ্ছিল সে যেন ইস্কুল থেকে এসেছে, আর মা তার সামনে খাবার দিয়েছেন। ঠিক এই রকম লুচি আর মিষ্টি মা দেন।

অবশ্য তখন শানু মোটেই খেতে চাইত না।

মা তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। কত সেধে তাকে খাওয়াতেন।

আহা মাকে কত জ্বালাতনই করেছে শানু।

তবু পরের হাত থেকে খাবার নিতে তার একটু লজ্জা করে, তাই কিছু না বলে চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু বটু ততক্ষণে হাত বাড়িয়েছে। যদিও মুখে বলছে, 'বাঃ আপনারা তো আর আমাদের জন্যে ভাগ নিয়ে আসেন নি?'

ভদ্রমহিলা স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলেন, 'গাড়ীতে খাবার একটু বেশীই নেওয়া হয়ে যায়, সব সময়ই বাড়ে। খাও খাও।...নাও খোকা!'

'খোকা'ও নিয়েই ফেলে।

ইস্! লুচি যে এমন ভাল খেতে, একথা কে কবে জানত!

জীবনে কত লুচিই ফেলে দিয়েছে শান্তু!

খাওয়ার আগে আর কোন কথাই হয় না। খাওয়ার পর, শান্তু ভুরু কুঁচকে আস্তে আস্তে বটুকে বলে, 'তুমি অত সব বাজে কথা বললে যে? মিথ্যুক কোথাকার!'

'বাঃ বলে তোর কোন ক্ষতিটা করলাম শুনি যে, গাল পাড়ছিস? এই তো কেমন খাসা খাওয়াটি হল।'

'হোক! তা' বলে মিথ্যে কথা বলবে? আমি তোমার ভাগ্নে? তুমি সত্যি খাবার কিনছিলে?'

'আরে বাবা, তাতে হয়েছে কি? আমার যদি একটা দিদি থাকত, তোর মতন একটা ভাগ্নে হতে পারত না? আর পকেটে পয়সা থাকলে কিনতাম না? ওর সব খাবারগুলোই কিনতাম। ভগবান মেরেছে, তাই—'

শান্তু ঈষৎ নরম হয়ে গম্ভীর গলায় বলে, 'তা হোক! মিথ্যে কথা বলতে নেই। আর কখনো বোলো না।'

'একবার যদি কিছু টাকা পাই, জীবনেও বলব ভাবছিস? কক্ষনো না। দিব্যি ভদ্র সভ্য সাধু হয়ে যাব।'

আর একবার খবরের কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরে বটু।

শান্তু বিস্মিত হয়ে বলে, 'তুমি খালি ওই পচা পুরনো কাগজটায় কি দেখছ বল তো? কাগজটা দেখছ আর আমার দিকে তাকাচ্ছ। বিচ্ছিরি লাগছে আমার।'

'বিচ্ছিরি লাগছে?'

বটু ম্লানভাবে বলে, 'দেখছিলাম একটা জিনিস। যাক আর দেখব না।'

শান্তু বলে, 'রাগ করছ কেন? এমনি কি রকম যেন করছ তুমি। নইলে এমনিতে তো তোমায় আমার ভালই লাগছে, তুমি আমার

বন্ধু হয়েছ। যদি তুমি রাজী হও তো আমাদের বাড়ীতে নিয়েও যেতে পারি তোমায়।'

'বাড়ী চিনে যেতে পারবি তুই?'

শান্তু একটু থতমত খায়।

এ বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হাওড়া ষ্টেশনে যখন এসেছিল বাড়ী থেকে, তখন কে ভেবেছিল রাস্তা চিনে রাখতে হবে? ট্যাক্সি করে চলে এসেছে—সমুদ্র দেখবার আনন্দ নিয়ে। আসলে তার ভরসা পুলিশ আর টিকিট চেকার।

যখন টিকিট নেই, নিশ্চয়ই টিকিট চেকার পুলিশে দেবে তাকে। পুলিশের কাছে জোর গলায় বাড়ীর ঠিকানা আর বাবার নাম বলবে শান্তু। আর বলবে, 'চল, নিয়ে চল আমায় সেখানে। কত টাকা নেবে নিও।

এই সবই ভেবে রেখেছে সে।

কিন্তু এখন বটুর প্রশ্নে থতমত খায়। তারপর বলে, 'কেন পারব না? ঠিকানা জানি না বুঝি? ট্যাক্সীওলাকে বলে দেব—'

'ট্যাক্সী? ট্যাক্সীভাড়া পাবি কোথায়?'

'বাঃ বাড়ীতেই তো পৌঁছে যাব। বাড়ীতে তো কত টাকা!'

বটু আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলে, 'তা যেন হল। কিন্তু বাড়ী গিয়ে যদি দেখিস কেউ বাড়ী নেই? তোর মা বাবা ওই দীঘায় না কোথায় আছে?'

অ্যাঁ!

তাই তো! এ কথা তো কই ভেবে দেখে নি শান্তু!

শুধু ভাবছে পুলিশ ফুলিশ যার সঙ্গেই হোক ট্যাক্সী করে বাড়ী চলে যাবে, আর দরজায় নেমেই চেঁচাবে, 'মা' শীগগির ট্যাক্সী ভাড়াটা দিয়ে দাও তো। আর এই পুলিশের হাতে ট্রেন ভাড়াটা তারপর সব বলছি!'

কিন্তু যদি দেখে বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ?

বুকটা কেঁপে ওঠে শানুর।

তখন যদি পুলিশ তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়? আবার তো তাহলে হারিয়ে যাবে শানু! হয়তো জীবনে আর কখনোই নিজেকে খুঁজে পাবে না।

বটু ওর দিকে তীক্ষ্ণ চক্ষু ফেলে তাকিয়েছিল। বলে, 'তোর বুঝি আর কোন চেনা বাড়ী নেই?'

'চেনা বাড়ী! চেনা বাড়ী! কেন থাকবে না? মামার বাড়ী আছে।'

'ঠিকানা জানিস?'

'নিশ্চয়!'

'তবে ঠিক আছে, কিন্তু—'

কী হল?'

'ভাবছি তুই কি আর তখন আমায় চিনতে পারবি?'

'চিনতে পারব না? বাঃ বেশ তো এতক্ষণ দেখলাম, বন্ধু করলাম, আর ভুলে যাব? কী ভাবছ তুমি আমায়?'

হঠাৎ বটু ওর হাতটা ধরে বলে, 'সত্যি যদি বন্ধু ভাবিস, ঠিক তুই আমায় টাকা পাইয়ে দিতে পারিস। অ—নে—ক টাকা।'

নয়

শানুর দিদিমা যাবেন 'হারানো কালী'র মন্দিরে পুজো মানতে। রেলে চেপে যেতে হয়। সেখানে মন্দিরের সামনে একটা বটগাছ আছে। সেই বটগাছের কাছে চুপি চুপি নিজের হারানো জিনিসটির নাম বলে গাছের ডালে একটা ঢিল বেঁধে দিতে হয়। যখন হারানো জিনিস আবার পাওয়া যায়, তখন এসে ঢিল খুলে দিয়ে পুজো-টুজো দিতে হয়।

এসব মন্দিরের খবর শানুর দিদিমা তাঁর মামাতো ননদের খুড়শাশুড়ীর ভগ্নীপতির বোনের কাছে পেয়েছেন। তিনি নাকি ওই মানত করে একটা হারানো টিয়াপাখী পেয়েছিলেন। খাঁচা খুলে পালিয়ে গিয়েছিল টিয়াটা, আর ঠিক ওই মানত করার পরদিনই দেখা গেল টিয়াটা বারান্দার রেলিঙে বসে।

দিদিমা বললেন, 'একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে। এও খাঁচা খুলে পালিয়ে গেছে, তবে পাখী নয়—মানুষ, এই যা।'

শানুর ছোটমামা মায়ের তোড়জোড় দেখে বলেন, 'যত্তোসব রাবিশ! গাছের ডালে ঢিল বাঁধলে হারানো ছেলে ফিরে আসে—'

দিদিমা রেগে গিয়ে বলেন, 'আসে না তো ওদের এলো কী করে?'

'ওদের তো পাখী!'

'পাখী আর মানুষ! একই কথা!'

'একই কথা? তা ভাল। আসলে কিন্তু পাখীটা উড়তে উড়তে হঠাৎ চেনা জায়গা দেখতে পেয়ে বসেছিল। শানু তো আর উড়তে জানে না?'

'না জানুক। এই তো টুনি জ্ঞান-বাড়ী, জ্যোতিষ-বাড়ী, এত সব করল। আমিও না হয়—'

'করল। ফলটা কী হল? যত্তোসব রাবিশ।'

দিদিমা গম্ভীরভাবে বলেন, 'আর এই যে তোরা কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করছিস, গোয়েন্দা পুলিশ লাগিয়ে এত এত পয়সা খরচ করছিস, তাতে কাজ হচ্ছে?'

'এখনও হয় নি। হবেই, এই আশায় চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

দিদিমা জোর দিয়ে বলেন, 'আমারও সেই আশা। দেখিই না কী হয়।'

ছোটমামা মুচকি হেসে বলেন, 'তা দেখো। তবে এক কাজ কর—ঢিল নয়, সোজাসুজি একখানা থান ইঁটই বেঁধে দিয়ে এসো।'

'থান ইঁট। থান ইঁট কেন?' দিদিমা হাঁ করে তাকান।

'আহা বুঝছো না?' ছোটমামা মুখটা বেশ ভারিক্কী করে বলেন, 'টিয়াপাখীর জন্যে একটা ঢিলই যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু মানুষ উড়িয়ে আনতে হলে—'

'থামো তুমি ছোড়দা,' শানুর মা কেঁদে উঠে বলেন, 'শানুর কথা নিয়ে ঠাট্টা করছ তুমি?'

ছোটমামা তো অপ্রস্তুতের একশেষ। তাড়াতাড়ি বলেন, 'আহা-হা শানুর কথা নিয়ে কেন? মার সেই মামাতো বোনের খুড়শাশুড়ী না কি—'

'ওই হল। শানুর কথা নিয়ে তোমরা কেউ ঠাট্টা করতে পাবে না।'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা!' ছোট মামা বলেন, 'তুই কান্না থামা। আর্শী দিয়ে কোনদিন দেখেছিস নিজেকে? কী অবস্থা হয়েছে শরীরের?'

শানুর মা চোখ মুছে বলেন, 'শানুকে যদি ফিরে না পাই, আমার বেঁচে থেকেই বা কী লাভ?'

'আহা চমৎকার! আর শান্তু যখন ফিরে আসবে, তখন মরে পড়ে থাকলেই পরম লাভ, কেমন? ছেলেটা ঘরে ফিরলে, তুই তার যত্ন করবি, না সে তোর সেবা করতে বসবে? তা'ছাড়া মরে গেলে তো কথাই নেই। তুই কি এটা চাস, শান্তু এসে দেখুক মা মরে ফর্সা? বাড়ীতে শুধু চাকর বাকরের রাজ্য—'

'আঃ ছোড়দা!'

'তা, আঃ করলে আর কি হবে? আমার কাছে সোজা কথা! না খেয়ে খেয়ে আর কেঁদে কেঁদে মরে যাব! যত্তোসব রাবিশ! এই তো গেল সপ্তাহ থেকে সমস্ত কাগজে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। যদি কেউ লুকিয়ে রেখে থাকে, সে ওই টাকাটির লোভে সুড়সুড় করে ফেরৎ দিয়ে যাবে।'

'তবে এত দেরি করলে কেন? সেই গোড়ায়—'শান্তুর মা বকে ওঠেন।

ছোটমামা বলেন, 'হয়েছিল! এক হাজার টাকা বলা হয়েছিল! দেখা গেল তাতে মাছ টোপ গিলল না। তাই—'

দিদিমা বিরক্তভাবে বলেন, 'তুই থামবি মোনা? তোর পুলিশেই হোক আর কাগজেই হোক আর আমার মানতেই হোক, ছেলেটা ফিরে এলেই তো হল?'

'বাঃ! তুমি কি তোমার 'হারানো কালী'র মহিমাটি ছাড়বে? ঠিক বলবে—ওই বটগাছে থান ইঁট বেঁধেই—'

'ছোড়দা!' শান্তুর মা বলেন, 'বাজে কথা রাখো। ওই কাগজে এই কথাটাও জানিয়ে এসো—ওই পাঁচ হাজারের ওপর এক ছড়া সোনার হারও দেওয়া হবে ছেলেচোরকে।'

'সোনার হার! সেটা আবার কে দেবে?'

'আমি দেব। আবার কে? শান্তুকে ফেরৎ দিলে শুধু হার কেন, আমার গায়ের সমস্ত গহনা তাকে দিয়ে দিতে পারি। তুমি সেই কথাই লিখে দিয়ে এস।'

ছোটমামা মাথা চুলকে বলেন, 'তা আসছি। কিন্তু ভাবছি—'

'কী ভাবছ?'

'ভাবছি বড্ড মিস করে ফেলেছি।'

'মিস করেছো? কী মিস করেছো?'

'ভাবছি আহা রে! সময় কালে আমিই কেন ছেলেটাকে চুরি করে সরিয়ে ফেলিনি!' বলেই বোঁ-বোঁ করে পালান ছোটমামা।

শানুর ছোটমামার স্বভাবই ওই।

শত দুঃখের কথা নিয়েও ঠাট্টা তামাসা হাসি! বলেন, 'সবাই মিলে হাঁড়িমুখ করে বসে থাকলে, কিংবা আকাশ ফাটিয়ে কাঁদলে যদি দুঃখের প্রতিকার হয়, তো ত্রিভুবন ফাটিয়ে কাঁদতে রাজী আছি। কিন্তু তা যখন নয়, খামোকা কেঁদে আর হাঁড়িমুখ করে শরীরটাকে নাজেহাল করি কেন?'

কিন্তু শানুর মা তাঁর ছোড়দার এসব ব্যবহার দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ছেলে হারিয়ে গেছে, মা কাঁদবে না? মানুষ কি পাথর?

'তুই তা হলে যাবি না টুনু?' বলেন শানুর দিদিমা!

টুনু অর্থাৎ শানুর মা ম্লানমুখে বলেছিলেন, 'নাঃ! যদি ঠিক আজই শানু এসে পড়ে!'

শানুর আসার ভাবনায় শানুর মা দু'দিন বাপের বাড়ীতেও থাকতে পারছেন না। শানুর দিদিমা তো কত বলছেন, 'তোর এত মন খারাপ, এত শরীর খারাপ, আমার কাছে এসে থাক।'

কিন্তু কি করে থাকবেন শানুর মা?

শানু না এলেও, যদি ঠিক সেইদিনই শানুর চিঠি আসে! যদি পিয়নে জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে যায়, আর বৃষ্টি এসে সে চিঠির লেখা মুছে নিয়ে যায়!

রোদে পৃথিবী ফাটছে, আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, শান্তুর মা ভাবেন যদি বৃষ্টি আসে।

অগত্যা শান্তুর দিদিমা একাই গিয়েছিলেন। আর এসে গায়ে কাঁটা দেওয়া ভয়ানক একটা কথা বললেন। টিলটি বেঁধে দিয়ে যেই না তিনি তাঁর সেই মামাতো বোনের সঙ্গে ফিরছেন, হঠাৎ মনে হল একটা চলন্ত রেলগাড়ীতে শান্তু।

'শান্তু!'

চলন্ত রেলগাড়ীতে শান্তু।

'কোন্ দিকের গাড়ীতে? হাওড়া থেকে চলে যাওয়ার গাড়ী, না হাওড়ায় ফেরার গাড়ী? সঙ্গে কে ছিল তার? খুব কি রোগা হয়ে গেছে? তোমাকে চিনতে পারল না? দেখেছ তো ঠিক? সত্যই শান্তু না আর কেউ?'

শ'খানেক প্রশ্ন করে বসেন শান্তুর মা।

শান্তুর দিদিমা বলেন 'রোস বাছা, একে একে বলি। হাওড়া থেকে চলে যাওয়ার গাড়ী নয়, হাওড়ার দিকে আসার গাড়ী। সঙ্গে কে ছিল কি করে জানব? গাড়ীতে তো মেলাই লোক। রোগা? রোগা হয়ে গেছে কিনা অত ঝপ্ করে কি বোঝা যায়? এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে আসছে।...আমাকে চেনার কথা বলছিস? আমাকে আবার চিনবে কি? আমি তো উঠি-পড়ি করে ছুটে আসছি কালীপুর লোক্যাল পাছে ধরতে না পারি। আর সে—'

'তোমার কালীপুর লোক্যালই বড় হল?' শান্তুর মা মাকে প্রায় বকেই ওঠেন, 'শান্তুর গাড়ীটায় উঠে পড়তে পারলে না?'

'ওমা শোন কথা!' শান্তুর দিদিমা গালে হাত দিয়ে বলেন, 'সে তো চলন্ত গাড়ী—'

'তাতে কি? জানলা দিয়েও তো ঢোকা যায়'—শান্তুর মা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, 'আমি হলে তাই ঢুকে পড়তাম। ওগো মা গো, আমি কেন গেলাম না গো! আমি দেখতে পেলে—'

শানুর দিদিমা বিপদ গণে বলেন, 'আহা অত উতলা হচ্ছিস কেন? ঠিকই যে শানু, তা'ও তো নিয্যস করে বলতে পাচ্ছি না। মনে হল ঠিক শানুর মতন!'

শানুর ছোটমামা গম্ভীরমুখে বলেন, 'ও আর দেখতে হবে না—শানুই। এ হচ্ছে ঢিলের আমোঘ শক্তি? যেমন আকাশে ঘুড়িকে ঢিল লঙ্গর করে নামানো হয়, তেমনি—'

'ছোড়দা!'

'আচ্ছা বাবা থামছি, থামছি! যত্তোসব রাবিশ!'

শানুর মা আবার নিজের মাকে নিয়ে পড়েন।

'হাওড়ায় নেমে তুমি কেন খুঁজলে না?'

'ওমা! সে হল গে আগের গাড়ী। তারপর কত গাড়ী এসেছে গিয়েছে, লক্ষ লোকের ভাড়। সেখানে কোথায় সেই একফোঁটা ছেলেটাকে খুঁজতে বসব?'

'পৃথিবীর সমস্ত লোক ভীড় করে দাঁড়ালেও শানুকে খুঁজে পাওয়া যায়' শানুর মা বলেন, 'আমি গেলে পেতাম!'

শানুর বাবা এ বাড়ী থেকে শানুর মাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, শুনে বললেন, 'এমনও হতে পারে, আপনি ভুলই দেখেছেন। শানুর মত দেখতে অন্য কোনও ছেলে—'

শানুর মা কেঁদে ফেলে বলেন, 'আমার শানুকে অন্য ছেলে করে দিচ্ছ?'

শানুর বাবা হতাশ দৃষ্টিতে তাকান।

শেষ পর্যন্ত না মানুষটা পাগল হয়ে যায়! রাতদিন শুধু কান্না। শানুর বাবারই কি কষ্ট হচ্ছে না? কিন্তু কী করবেন? চেষ্টার তো ত্রুটি হচ্ছে না।

পুলিশ তো সেই কোথায় পাঞ্জাব, কোথায় মধ্যপ্রদেশ, কোথায় উত্তর ভারত, চর পাঠাচ্ছে। ওই সব জায়গায় নাকি যত সব ছেলে-চোরের এক একটা আড্ডা আছে। ভদ্রলোকের ছেলেদের চুরি

করে নিয়ে গিয়ে গুণ্ডা, পকেটমার, চোর, জোচ্চোর এই সব তৈরী করে।

মাঝে মাঝে শান্তুর বাবারই কি কান্না পায় না? লুকিয়ে লুকিয়ে কি চোখের জল মোছেন না এক-আধবার? উপায় কি? অফিসেও যেতে হচ্ছে, কাজকর্মও করতে হচ্ছে। সবই হচ্ছে।

এখন মাঝে মাঝে ভেবে ভয়ানক আশ্চয্যি লাগে, চিরকাল ধরে প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে 'নিরুদ্দেশ' আর ছেলে হারানোর খবর পড়ে আসছেন, কই কোনদিনই তো বুঝতে পারেন নি সেটা এমন ভয়ানক! খবর না খবর, এই ভেবে পাতা উল্টে গেছেন, খেলার খবরে মন দিয়েছেন।

একদিনের জন্যেও তো মনে হয় নি তাদের কাছে গিয়ে খোঁজ করি, সেই হারানো ছেলেটাকে তোমরা পেয়েছ কি না? কিংবা কাগজে ছাপানো হারানো ছেলেমেয়ের ছবিগুলো পকেটে রেখে রাস্তার ভীড়ের মধ্যে চোখ ফেলে তো খুঁজে খুঁজে দেখেন নি মেলে কি না!

হায় হায়!

সেই অপরাধেই বোধহয় আজ শান্তুর বাবার এত কষ্ট। এখন এর মধ্যে শান্তুর বাবা দু-তিন জায়গায় খোঁজ করেছেন। একজন বিজ্ঞাপনে ফোন নম্বর দিয়েছিল। শান্তুর বাবা ফোনে জিগ্যেস করেছিলেন, 'সেই ছেলেটাকে পেয়েছেন? যার জন্য কাগজে—'

অদৃশ্য থেকে ভদ্রলোক বলেন, 'হ্যাঁ পেয়েছি। আপনি কে বলুন তো?'

'আমি কেউ না। কী করে পেলেন তাই বলুন।'

সে ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন, 'দুষ্টুমী করে দু-তিনটে বন্ধুতে মিলে দুর্গাপুরে বেড়াতে গিয়েছিল বাড়ীতে না বলে।'

আর দু'জন জানিয়েছিল পাওয়া যায় নি। খুব আগ্রহ করে জিগ্যেস করেছিল, 'আপনি পেয়েছেন কোনও খবর?'

শান্তুর বাবা শুধু বলেছিলেন, 'হায় ভগবান!'

পাঁচ হাজার টাকার লোভে, যারা শান্তুকে নিয়ে আটকে রেখেছে, দেবে না ফিরিয়ে?—এক একবার ভাবেন শান্তুর বাবা। আর একবার সেই অগাধ সমুদ্রের কথা মনে পড়ে স্তব্ধ হয়ে যান!

সমুদ্রের তলায় কি গোয়েন্দা পুলিশ হানা দিতে পারে? সেখানে কি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পৌঁছয়?

হায়, রূপকথা যদি সত্যি হতো! তা হলে হয়তো শান্তু জলের তলায় এক স্ফটিক পুরীর রাজবাড়ীতে আশ্রয় পেত! আর একদিন ঝিনুকের নৌকায় চড়ে হুস্ করে জলের ওপর উঠে আসত!

মেদিনীপুরের মেলায় শান্তুর মত একটা ছেলেকে দেখা গিয়েছিল। কে জানে সে কে! বৃষ্টিতে ভেজা চিঠিখানা শান্তুর?

কে জানে সত্যি না ভুল।

শান্তুর স্কুল থেকে মাষ্টারমশাইরা আসেন খোঁজ নিতে, আসেন পাড়ার লোকেরা। ত্রিজগতে যত রকম ছেলে হারানোর ঘটনা তাঁদের জানা আছে, তার বিবরণ দিতে থাকেন. আর শান্তুর বাবা বসে থাকেন পাথরের পুতুলের মত।

কিন্তু হঠাৎ আবার এক নতুন চাঞ্চল্য আনলেন শান্তুর দিদিমা। ছুটন্ত রেলগাড়ীতে নাকি দেখেছেন শান্তুকে। সেই জ্যোতিষী মশাইও কিন্তু বলেছিলেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন শান্তু রেলে বসে আছে। সে তো অনেক দিনের কথা! একমাস ধরে শান্তু রেলেই বেড়াচ্ছে?

ধ্যেৎ সব বাজে! জ্যোতিষীও বাজে ধাপ্পা দিয়েছেন। শান্তুর দিদিমাও ভুল দেখেছেন। শান্তু সেই দীঘার সমুদ্রে—

ওদিকে বটু আর শান্তুর কথাবার্তা চলছে। বটু বলল, 'এই হচ্ছে ব্যাপার! এখন তুই যদি আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে নিজে নিজে বাড়ী চলে যাস, আমার কিছু করবার নেই—শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া। তবে যদি ওই যা বললাম, তাতে রাজী থাকিস—'

শান্তু ভুরু কুঁচকে দাঁত কামড়ে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে তারপর প্রশ্ন করে, 'তাতে মা-বাবাকে ঠকানো হবে না?'

'কেন? ঠকানো কিসের? ওঁরা তো তোর জন্যে খরচ করতেই চান।'

'বেশ! তুমি যা বলছ, তাই হবে।'

'ইস! কী লক্ষ্মী ছেলে! বাঁচলাম তোর কথা শুনে। ভাবছিলাম তুই হয়তো রাজী হবি না—হয়তো ছিটকে পালিয়ে গিয়ে—'

শান্তু গম্ভীরভাবে বলে, 'না তা করব না। তুমি যে বলেছ অনেক টাকা পেলে তুমি আর মিথ্যে কথা বলবে না।'

'সে তো এখনো বলছি! মিথ্যে কথা বলা, ধাপ্পা দেওয়া, এসব কি আমার সাধ? নেহাৎ তখন পেটের জ্বালায়—তাছাড়া তোকে আমার ঠিক নিজের ভাগ্নে বলেই মনে হচ্ছে রে শান্তু! ইচ্ছে হচ্ছে তোকে আমার কাচের বাসনের দোকানের সাকরেদ করে নিই। তোতে আর আমাতে বড়বাজারে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সুন্দর সুন্দর সব বাসন কিনব—

শান্তু হঠাৎ বলে ওঠে, 'তাহলে ডিংলাইকেও নিতে হবে।'

বটু শুনতে না পেয়ে থতমত খেয়ে বলে, 'কাকে নিতে হবে?'

'আমার একজন বন্ধুকে!' দৃঢ় গলায় বলে শান্তু।

'নাম কি বললি বন্ধুর?'

'ডিংলাই—ডাকনাম। ভাল নাম নারায়ণ।'

বটু হেসে উঠে বলে, 'ডাকনামটি বড় খাসা! থাকে কোথায় সে? তোদের পাড়ায়?'

'পাগলের মত কথা বোলো না। সে তো দীঘায় থাকত। তারপর বাড়ী ভেঙে উঠে গিয়ে মেলায় চলে এল। ওর কথা ভেবে মন কেমন করছে।'

বটু অবাক হয়ে বলে, 'তোর এ কথাগুলো তো মোটেই সহজ লাগছে না। কেমন যেন গোলমেলে। বাড়ী ভেঙে চলে যাওয়া মানে?'

শান্তু বিরক্তস্বরে বলে, 'মানে আবার কি? ওদের ওই রকমই নিয়ম। ওরা যে কাকমারা!'

'কাকমারা!'

বটু 'হাঁ'। এ নাম ও জন্মেও শোনে নি।

শান্তু আরও রেগে উঠে বলে, 'তুমি যে একেবারে অবাক হয়ে গেলে? কাকমারা জান না?'

শান্তু নিজেও যে মোটেই জানত না, আর শান্তুর মা বাবা দিদিমা মামারা যে যেখানে আছে, কেউ জানে কি না সন্দেহ, সে কথা মনে পড়ে না শান্তুর। শান্তু বটুর বোকামীতে চটে ওঠে।

বটু কিন্তু হেসেই অস্থির।

'না বাপু জানি না। কী করে তারা? কাক মারে?'

'মারেই তো!'

'মেরে কি করে? খায়?'

'খায়ই তো!'

'ওঃ মাঃ! আর সে তোর বন্ধু? ছি ছি!'

বন্ধুর নিন্দেয় আগুন হয়ে উঠে শান্তু বলে, 'ছি ছি বলবার কী আছে? লোকে বাঘ মারে না? সিংহ মারে না?'

'মারে তার কি? খায় না তো? সে তো শিকার।'

'ইস্ ভারী তর্ক শিখেছ। আর মাছ মারাটা কি? মাছ মারা, মুরগী মারা, হাঁস মারা, পাখী মারা—'

'ওসব তো মানুষের খাবার জিনিস। কাক কি খাবার জিনিস?'

'তা কে বলেছে মানুষকে ওসব খাবার জিনিস?' শানু রেগে আরও আগুন হয়ে বলে, 'ভগবান বুঝি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় বলে দিয়েছেন, ওইসব খাবার জিনিস, আর কাক খাবার জিনিস নয়! চীনারা তো আরশোলা খায়, ব্যাং খায়—'

'ঘাট হয়েছে বাবা! আর তর্ক করব না। মানছি তোর বন্ধু খুব ভাল। কিন্তু তুই এত রাগী কেন বল তো? বাব্-বাঃ!'

শানু এবার একটু লজ্জিত হয়ে বলে, 'বাঃ তুমি তো রাগিয়ে দিলে! বন্ধুকে বিচ্ছিরি বললে বুঝি রাগ হয় না?'

'আর বলব না। কিন্তু তাকে পাচ্ছিস কোথায়? বলছিস তো বাড়ী ভেঙে চলে গেছে।'

শানু বিষণ্ণমুখে বলে, 'সেই তো! কে জানে আর কক্খনো দেখতে পাব কি না।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ থাকে।

তারপর বটু আস্তে আস্তে বলে, 'আমি চেষ্টা করব তোর বন্ধুকে খুঁজে বার করতে।'

'না—থাক।'

'কেন রে, থাক কেন?'

'তাকে দেখলে হয়তো তোমরা হাসবে। আমি বড় হয়ে খুঁজে বার করব।'

এরপর আর কথা বেশী জমল না।

শুধু বটু পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার করে শানুদের বাড়ীর আর মামার বাড়ীর ঠিকানাটা লিখে নিল।

কিন্তু, এ কী, গাড়ী যে হাওড়াতে এসেই গেল, টিকিট-চেকার কই?

চেকার উঠলই না শানুদের কামরায়।

বটু বলে, 'তুই বেশ পয়মন্ত। নইলে ওই চেকার উঠে আমায় কম নাজেহাল করত!'

নেমে পড়ল ওরা।

কলকাতায়।

সেই হাওড়া ষ্টেশন—যেখান থেকে শান্তু মার সঙ্গে বাবার সঙ্গে রাজপুত্তুরের মত আদরে দীঘায় যাবার জন্যে ট্রেনে চড়েছিল।

কী আশ্চর্য্য! সব ঠিক তেমনি আছে! একেবারে অবিকল! শান্তু যে কোন অজানা রাজ্যে হারিয়ে গিয়ে কী না কাণ্ড করে এল – কিছুই জানল না এরা! কী অদ্ভুত! কী অদ্ভুত!

'বটুদা! শীগগির একটা ট্যাক্সী নাও।' বলে শান্তু।

'নিচ্ছি রে বাপু, নিচ্ছি।'

'বটুদা, আমি আর এক মিনিটও দেরী সইতে পারছি না!'

বটু বলে, 'রোস, একজন বাঙালী ড্রাইভারের গাড়ী নিই। ওই দাড়িওলা পাঁইজীদের দেখলেই আমার কেমন ভয়-ভয় করে।'

'আরে ভয় কী?'

হেসে ওঠে শান্তু।

'তা হোক। বাঙালীই দেখি।'

কিন্তু হায়! কে জানত এই বাঙালী দেখাই কাল হবে বটুর!

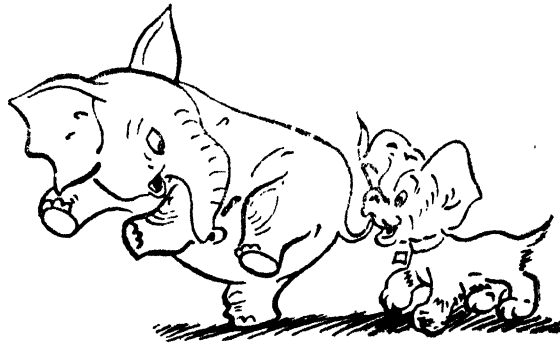

দশ

ড্রাইভার ওদের দিকে একবার বেশ ভাল করে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় যাবেন ?'

বলল শানুর দিকেই তাকিয়ে।

শানুকে 'আপনি' বলায় পুলকিত শানু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'কেয়াতলা। সতেরর সি 'কেয়া—'

সঙ্গে সঙ্গে বটু করুণভাবে বলে, 'সে কিরে, কলকাতার মাটিতে পা দিয়েই সব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি ?'

শানুর মনে পড়ে যায়। লজ্জিতমুখে বলে, 'ইস্! একদম ভুলে গেছি। না না, কেয়াতলা নয়, এখন আমরা ইয়েতে—কোথায় ? মানে কোথায় যাচ্ছি ?'

'চালতাবাগান! চালতাবাগান ফার্ষ্ট লেন।'

ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে আত্মীয়তার সুরে বলে, 'কোথা থেকে আসছেন ?'

'খড়গপুর থেকে।'—তাড়াতাড়ি বলে ওঠে শানু।

কলকাতায় পা দিয়ে তার বুকের মধ্যে এত তোলপাড় করছে যে, চুপ করে থাকতে পারছে না। বটুই যেন কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। অথচ বটু এ পর্য্যন্ত শেখাতে শেখাতে এল তাকে, 'তুই চুপচাপ থাকবি, যাকে যা বলবার আমি বলব।'

ড্রাইভার খানিকটা চালিয়ে আরও অমায়িক ভাবে বলে, 'বেড়াতে গিয়েছিলেন ?'

এবার বটুই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'হ্যাঁ। পিসির বাড়ী।'

'ওঃ! দুই ভাই বুঝি ?'

ড্রাইভারের এই আত্মীয়তায় শান্তু খুসি হলেও বটু হয় না। সে মনে মনে প্রমাদ গণে। চুপচাপ চল না বাবা, বেশী কথায় কাজ কি!—এই তার মনোভাব। তবু কথার উত্তর না দেওয়াটা সন্দেহজনক। তাই শুধু বলে, 'হাঁ'।

কিন্তু ততক্ষণে শান্তু ছিটকে উঠেছে—'এ কী! [illegible] বলে নিজেই ভুলে মেরে দিচ্ছ? কী ঠিক হয়েছিল? মামা আ[illegible] লাগে না? আমি মামা—না না, ইনি মামা, আমি ভাগ্নে।···ড্রাইভার, এ হচ্ছে আমার মামা, আমি ভাগ্নে, বুঝতে পেরেছো?'

ড্রাইভার মৃদু হেসে বলে, 'পেরেছি।'

বলে এবং গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দেয়।

ওদিকে বটু ফিসফিসিয়ে বলে, 'অত কথা কইছিস্ কেন? মনে হচ্ছে লোকটা সুবিধের নয়।'

'ধ্যেৎ! বেশ ভাল, বাবুর মতন দেখতে

'সেটাই অসুবিধের। পাঁইজীর গাড়ী নিলেই হত!'

ড্রাইভার যদি ওদের কথায় মন না দিত, তা হলে এই চুপি চুপি কথা শুনতে পেত না। কিন্তু কেন কে জানে সে ওদের কথায় মন প্রাণ কান সব দিচ্ছে, কাজেই শুনতে পাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে, যখন রাস্তায় আলোর নির্দ্দেশে গাড়ী থামিয়ে থাকছে, তখন বুক-পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবুকের মাঝখানটা খুলে খুব সন্তর্পণে কী যেন দেখছে।

'লোকটা নোটবুক খুলে ছবির মতন কী যেন দেখছে রে?'—বটু বলে আস্তে।

শান্তু সবজান্তার ভঙ্গীতে বলে, 'বোধ হয় লাইসেন্স।'

'খালি খালি দেখবে কেন?'

'বোধ হয় নম্বর ভুলে গেছে।'

বটুর কিন্তু ভাল লাগে না। সে এক মনে ড্রাইভারের দিকেই তাকিয়ে থাকে। আর সে এক মনে গাড়ী চালিয়ে চলে।

হঠাৎ এক সময় বটু যেন চমকে উঠে ড্রাইভারকে বলে 'কোন্ দিকে যাচ্ছেন আপনি ?'

'কেন ! যেখানে বলেছেন।'

'কিন্তু রাস্তাটা এত অচেনা অচেনা লাগছে কেন? চালতা-বাগান তো ভবানীপুর। এটা কি 'ভবানীপুরের দিকে যাচ্ছে ?'

ড্রাইভার চমকে উঠেছে, এইভাবে বলে, ভবানীপুরে ? বলেন কি ? বরানগরে একটা চালতাবাগান আছে না ?'

বটু বিচলিত ভাবে বলে, 'থাকতে পারে। শুধু চালতাবাগান কেন, আমবাগান, কাঁঠালবাগান, কচুবাগান, কলাবাগান সব কিছু থাকতে পারে। কিন্তু আমার দরকার ভবানীপুরে। এ কি আপনি বরানগরের দিকে যাচ্ছেন নাকি ?'

'আপাততঃ।'

'আপাততঃ ! তার মানে ?'

'মানে আর কিছু নয়। এই দিকে আমার বাসা। আবার ভবানীপুরের দিকে যেতে হলে তো টাইম লাগবে। আমি বাসায় একটা কথা বলে যাব।'

'না না, তোমার এখন বাসায় টাসায় যাওয়া হবে না।'

উত্তেজনার চোটে বটু ভদ্রতা ভুলে 'তুমিই সুরু করে দেয়, 'আগে আমাদের পৌঁছে দিয়ে এস। তুমি এদিকে এলে কেন ? যাব দক্ষিণে, তুমি নিয়ে এলে উত্তুরে। এর মানে ?'

ড্রাইভারের চটে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু যতদূর সম্ভব নরম গলায় বলে, 'তা আপনারাও তো আগে বললেন না। যাক নিয়ে তো যাচ্ছি ! শুধু বাসায় একবার, মানে আমার মায়ের খুব অসুখ, ডাক্তারকে আসতে বলেছিলাম, এসেছে কিনা তাই দেখে যাবো।'

বটু চটে উঠে বলে, 'দরকারের সময় অমন অনেক 'মায়ের অসুখ' গজায়। 'মায়ের অসুখ' যে কী জিনিস, আমার আর জানতে বাকী

নেই। ওসব হবে না। বেশ তুমি তোমার এই পর্যন্তর ভাড়া মিটিয়ে নাও, আমরা অন্য গাড়ী—'

ব্যস! বটুর তড়পানির মূলে কুঠারাঘাত করে শানু বলে ওঠে, 'ভাড়া কোথা থেকে দেবে শুনি? পকেট তো গড়ের মাঠ। বাড়ী না পৌঁছলে—'

বটুর হাতের একটা প্রবল চিমটিতে চুপ করে যেতে হয় শানুকে।

আর ড্রাইভার বেশ একটু দুষ্টু হাসি হেসে গাড়ীর স্পীড্‌টা আরও বাড়িয়ে দেয়।

'এই এই এতো জোর চালাচ্ছ কেন?' বটু চেঁচায়।

ড্রাইভার একবার ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'এত ভয় পাচ্ছেন কেন? সঙ্গে অনেক টাকা আছে বলে তো মনে হল না। গায়ে গহনাও নেই। আশ্চর্য্য তো! তাড়াতাড়ি খবরটা দিয়েই ফিরব বলে—'

বলতে বলতে সে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে একটা পচা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। অতি কষ্টে গাড়ীটা ঢোকে সেখানে। এখানে এসে গাড়ী থামায় সে।

'ভীরু' বলে উপহাস করায় শানুর হয়ে গিয়েছে রাগ। তাই চড়া গলায় বলে ওঠে, 'এখানে ঢুকলে যে? এইখানে তোমার বাড়ী নাকি?'

'তা গরীবের বাড়ী কি আর চৌরঙ্গীতে হবে?' বলে, ড্রাইভার নেমে পড়ে এবং গলির মধ্যেই একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়ে।

বটু বলে, 'এই শোন। মনে হচ্ছে লোকটার মতলব ভাল নয়।'

শানু অবাক হয়ে বলে, 'কেন? খারাপের কী দেখলে তুমি? ওর মার অসুখ করেছে, ও দেখবে না ডাক্তার এল কিনা?'

'ওসব অসুখ টসুখ মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে কথা!' শানু উত্তেজিতভাবে বলে, 'মিথ্যে করে কেউ বলতে পারে মায়ের অসুখ? তুমি পাগল নাকি?'

'তুই জগতের কী-ই বা দেখেছিস্? ওরকম বলে অনেকে। আমি বলছি এখানে বসে থাকলে বিপদ হবে। চল নেমে পড়ে পালাই।'

বটু নেমে পড়ে।

নেমে পড়ে একেবারে রাস্তার পাশে জড়-করা জঞ্জালের ওপর।

'এঃ ছি ছি! কী নোংরা। এখানে পা দেব কি করে?'

শান্তু নাক সিঁটকে ওঠে।

কিন্তু ততক্ষণে বটু উঠেছে ভীষণ রেগে। সবলে ওর একটা হাত ধরে টান মেরে বলে, 'তুই আসবি কিনা? নোংরা! এঃ ভারী পুরুত ঠাকুর এসেছে! চল বলছি শীগগির—'

অগত্যাই শান্তু নেমে পড়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ড্রাইভার এসে পড়ে এবং ব্যাপারটা বুঝে ফেলেই ওদের যাবার পথ আটকে চীৎকার করে ওঠে, 'চোর চোর!'

সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটে সে বোধ করি আর বলতে হবে না।

'চোর চোর' শুনলেই যা হয়।

যেন মাটি ফুঁড়ে লোক উঠে শান্তুকে আর বটুকে ঘিরে ধরে 'কী! কী ব্যাপার?' বলে ড্রাইভারের দিকে তাকায়। তার হচ্ছে চেনা পাড়া।

ড্রাইভার বোঝায়, 'ব্যাপার আর কিছুই না। বাছাধনদের ট্যাঁকে নেই পয়সা, এদিকে ট্যাক্সী চড়ার সখ। এই এতক্ষণ গাড়ী চড়ে সাড়ে চার টাকা মিটার উঠিয়ে কেটে পড়তে যাচ্ছিলেন।'

'এঁ্যা! এইটুকু ছেলে, তাদের মধ্যে এত চালাকি!'

'ওই রকমই দিনকাল পড়েছে ভাই। যাক পুলিশে দিয়ে কোন লাভ নেই, খালি নিজেরাই হাঙ্গামায় পড়া। একটি বেলা উপোস দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখাই হচ্ছে বেষ্ট্। তোমরা একটু সাহায্য করো তো, একবার আমার ওই ঘরটায় পুরে ফেলি।'

ভারী যেন মজার কথা। এইভাবে হি হি করে করে হাসতে

হাসতে ওরা ঠেলাঠেলি করে বটুকে আর শান্তুকে সেই বিচ্ছিরি বাড়ীটার একটা ঘরে পুরে ফেলে।

শান্তু যতই হাত-পা ছোঁড়ে, 'আঃ ছেড়ে দাও' বলে, কে শোনে কার কথা! বরং সবাই আরও হাসে আর বলে, 'গাড়ী চড়ার বাসনা মিটে যাক।'

ওদের দুজনকে ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে হাসাহাসি করতে করতে চলে যায় ওরা। একজন আবার বলে, 'তুমি বারণ করলে রবিদা। নইলে দিতাম একবার দাদুদের মামার বাড়ী দেখিয়ে।'

'এই না না থাক। থাকুক খানিক জব্দ হয়ে, তারপর ছেড়ে দেব।' বলে ড্রাইভারটা হেসে চলে যায়।

ভ্যাপসা-ভ্যাপসা ঘরের মধ্যে শুধু বটু আর শান্তু।

একটা চৌকীতে বিছানা পাতা, দেয়ালে একটা জানলা। এদিকে ওদিকে দু'একটা টুকিটাকি। বোঝা গেল, এইটাই লোকটার ঘর।

বটু বিছানাটা তালগোল পাকিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে চৌকীর ওপর বসে পড়ে বলে, 'দেখলি? বলেছিলাম কি না লোকটার মতলব ভাল নয়?'

শান্তু এই এত দুঃখের পর, এত ঢেউ পার হয়ে কলকাতায় এসে পড়ে, আবার এভাবে জব্দ হয়ে যাওয়ায় একেবারে ভেঙে খান-খান হয়ে যাচ্ছিল। তবু বটুর কথায় সজোরে বলে, 'তুমি পালাতে গেলে কেন? তাই তো ওর রাগ হল। যদি না পালাতে, ও কক্ষণো আটকে রাখত না।'

'ভারী বুঝিস তুই! গোড়া থেকেই ও কি রকম যেন করছিল দেখছিলি না? আমার মনে হচ্ছে অন্য ব্যাপার।'

'কী ব্যাপার?'

'ও লোকটাও নিশ্চয় কাগজের বিজ্ঞাপন দেখেছে। তোকে ভাঙিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পেতে চায়।'

'ভাঙাবে মানে? আমি কি নোট?'

'হ্যাঁ রে বাবা, তুই এখন মস্ত দামী ব্যাঙ্কনোট।'

'তুমি যদি আগেই কেয়াতলায় যেতে, কক্ষণো এমন হত না।' বলেই হঠাৎ কেঁদে ফেলে শানু। অনেক সহ্য করেছে বেচারা আর পারে না।

এ যে একেবারে কূলে এসে তরী ডোবা।

বটু নিজের মাথায় একটা কীল মেরে বলে, 'সবই আমার কপাল, বুঝলি? হতভাগার কপাল। এ কপালে পাঁচ হাজার টাকা সয় কখনো? এ যেন কাকের সংগ্রহ করা মাংসের টুকরো। চিলে ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল।'

'শানু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'ও যখন আমাকে নিয়ে যাবে, আমি বাবাকে বলব, কক্ষণো ওকে টাকা দিও না।'

'ও কি আর তোকে নিয়ে যাবে ভেবেছিস?'

'নিয়ে যাবে না?'

'নাঃ! মনে হচ্ছে অন্য কৌশল করবে।'

শানু ভাবে, কী আশ্চর্য্য! শানুকে নিয়েই বা সবাইয়ের এত কৌশলের ইচ্ছে কেন? হারিয়ে যাওয়া শানু ঠিকই খুঁজে খুঁজে হেঁটে হেঁটে রাস্তার লোককে জিগ্যেস করে করে নিজেকে মার কাছে পৌঁছে যেতে পারত। দীঘার সেই সমুদ্রতীর থেকেই পারত। কিন্তু শানুর ওপরই সবাইয়ের নজর!

কেনই যে এ নজর! বটুর অনুমান কি সত্যি?

এ লোকটা কি আর আসবে?

না শানুদের এই ঘরের মধ্যেই বন্দী করে রেখে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবে?

কিন্তু শানুরা কীই বা এত দোষ করেছে ওর কাছে ?

নাঃ বটুর কথাই ঠিক। প্রথম থেকেই ওর মতলব খারাপ। নইলে ভুল দিকে নিয়ে আসছিল কেন ? শানুরা তো কত ট্যাক্সী চড়েছে, কই কখনো তো দেখেনি, ট্যাক্সীওলা নিজের বাড়ীতে এসে ঢোকে মার অসুখ বলে !

বটু চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। কোন কথা বলছে না।

দেখে ভারী মন কেমন করে শানুর।

ও কেয়াতলায় যেতে দেয় নি বলে যে রাগ হচ্ছিল সেটা চলে যায়। ভাবে, আহা বেচারী! কাঁচের বাসনের দোকান করা ওর আর হল না !

কিন্তু শানু কি পারবে না ওর ভাল করতে?

হায় ভগবান !

কী না পারত শানু !

সবই পারত যদি একটি বারের জন্যে বাবার সঙ্গে মার সঙ্গে, কি নিদেন পক্ষে ছোট মামার সঙ্গেও দেখা হত !

আস্তে ডাকে শানু, 'এই তুমি আমার ওপর রাগ করেছ ?'

'না রাগের কি আছে ? আর করিও যদি তো, তোর ওপর করব কেন ? করছি আমার ভাগ্যের ওপর।'

'আচ্ছা ও কি আমাদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলতে চায় ?'

'তোকে চাইবে না। আমাকে চাইতে পারে।'

বলে পাশ ফিরল বটু।

শানু মনে মনে ভাবতে লাগল। ডিংলাইয়ের দিদিমা আর মামাদের কবল থেকে ছাড়ান পেলাম, সাধন কুণ্ডুর কাছ থেকে ছাড়ান পেলাম, আর কলকাতায় এসে এই দুষ্টু লোকটার কবলে

পড়ে মরে যাব? ভাবতে ভাবতে সেও গুটিসুটি হয়ে বটুর পাশে চৌকীতে শুয়ে পড়ল।

আর কেমন একটু তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়ল—খিদেয় তেষ্টায় কাতরতায়।

একটু পরে ঘুম ভেঙে গেল ঠক-ঠক শব্দে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে হা করে তাকিয়ে রইল দু'জনেই, কোথায় আছে, কেন আছে বুঝতে সময় লাগল।

ততক্ষণে সেই ড্রাইভার, রবি যার নাম, সে জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে দু গেলাস চা।

'বলি শুনছো হে খোকারা, একটু গলা ভিজিয়ে নাও।'

বটু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চা-টা নেয়, কিন্তু নিয়েই বলে, 'কী দাদা, বিষ-মিশ্রিত চা? যাতে এক মিনিটেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়?'

লোকটা হা হা করে হেসে উঠে বলে, 'নাঃ! সে সখ নেই। দু দুটো লাশ পাচার করাও শক্ত। একটা কাজ করিয়ে নিতে চাই। তারপর ছেড়ে দেব।'

'কাজ? কী কাজ?'

'বলছি। আগে একটু খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হও।'

বলে সে হাত গলিয়ে দুখানা কেক আর দুটো সন্দেশ বাড়িয়ে ধরে।

'তোমার জিনিস আমরা খাব না।'

শানু তীব্রস্বরে বলে।

বটু গম্ভীরভাবে দুটা কেক আর দুটো সন্দেশই নিয়ে খেতে সুরু করে দিয়ে বলে, 'ওকে আর কিছু দাও। আমার তো এটুকু নস্তি।'

'আরে। আরে! তুমি সব খেয়ে নিলে?' লোকটা হেসে ফেলে, আবার কিছু নিয়ে এসে বলে, 'নাও খোকা, তুমি খেয়ে ফেল।

নচেৎ তোমার এই রাক্ষস বন্ধুটি সব খেয়ে ফেলবে। খাও। তারপর এই নাও কাগজ আর কলম। একটা চিঠি লিখে ফেল।'

'চিঠি? কার চিঠি? কিসের চিঠি?'

'আহা আস্তে। সবুরে মেওয়া ফলে। আমি এদিক থেকে বলে দেব, তুমি লিখে ফেলবে।'

'তোমার কথা আমি শুনব না।'

'তা হলে এই ঘরে চিরকাল বন্দী।'

লোকটা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

'বেশ বন্দী তো বন্দী।'

'ভাল! ভুল করলাম খেতে দিয়ে। পেট কাঁদলেই আপনিই কথা শুনবে।'

বটু বলে, 'কি লিখতে হবে?'

'তোমাকে নয়। শুধু একে। এই নাও—ধর না কাগজ-কলম। লেখ—

'বাবা, আমি কলকাতায় এসেছি। এসেই একটু অসুবিধেয় পড়ে গেছি। তুমি এই পত্রবাহকের হাতে, তোমার ঘোষণামত পাঁচ হাজার টাকা অবিলম্বে দিয়ে দেবে। তা হলেই ইনি আমায় বাড়ীতে পেঁছে দেবেন। কিন্তু একটি কথা, তুমি যেন চালাকি করে আবার পুলিশ-টুলিশ ডেকে এলো না। তা হলে আমারই বিপদ আছে। টাকা দিলেই ইনি আমাকে খুব যত্ন করে পেঁছে দেবেন। ইতি—

তোমাদের শান্তনু

শান্তু চমকে ওঠে।

'কে বললে আমার নাম শান্তনু?'

'জানি। সব জানতে হয়। দেখ লিখবে তো?'

'লিখতে পারি, যদি সত্যি পেঁছে দাও।'

'আরে দেব বলেই তো এত ব্যবস্থা।'

'তুমি বাবার চেনা নয়, বাবা টাকা দেবেন কেন ?

'দেবেন দেবেন। তুমি লেখ না।'

শানু বটুর দিকে তাকায়।

বটু অগ্রাহ্যভাবে বলে, 'দে লিখে। যা হয় হোক।'

শানু কাগজটা আর কলমটা টেনে লিখতে সুরু করে—

'শ্রীচরণেষু,

বাবা। আমি অনেক কষ্ট করে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি—'

এগার

'টু। টু।'

শানু আর বটু চমকে উঠল এই 'টু টু' শুনে। তাকিয়ে দেখল জানলার দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা মেয়ে 'টু' করছে। জানলা পর্য্যন্ত তার চোখ পৌঁছাবার কথা নয়। বোধ হয় উঁচু পিঁড়ির ওপর উঠেছে।

বটু বলে উঠল, 'তুই কে রে ?'

মেয়েটা হি-হি করে হেসে বলল, 'তুই কে রে ?'

'আমরা মানুষ।'

'আমি খুকু।'

শানু একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখতে পেয়ে যেন বর্তে গিয়ে বলে, 'তুই বুঝি এদের বাড়ীর খুকু ?'

'ধ্যেৎ বোকা। এটা তো রবি কাকাদের বাড়ী।'

'তবে তোদের বাড়ী কোথায়?'

'ওই ওইখানে।'

কোনখানে তা' অবশ্য বোঝা গেল না। তবু একটা ছোট্ট মেয়ের মিষ্টি কথা ওদের যেন প্রাণটা ঠাণ্ডা করে দিল।

শানু বলল, 'আমাদের সঙ্গে খেলবি?'

'কী করে?' মেয়েটা চোখ গুলি করে বলে, 'তোমাদের ঘর তো বন্ধ করে রেখেছ। দরজাটা খুলে দাও তা'হলে।'

'বাঃরে আমরা কি করে খুলব? দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ। তোর ওই রবি কাকা না কে, সে তো আমাদের বন্দী করে রেখেছে!'

'বন্দী করে রেখেছে তোমাদের?'

মেয়েটা জানলা থেকে নেমে দরজার দিকে চলে যায়। দেখতে পায় দরজার কড়ায় তালা ঝুলছে। আবার জানলায় এসে বলে, 'কেন বন্দী করে রেখেছে গো? তোমরা বুঝি চোর?'

'মোটেই না।' শানু সতেজে বলে, 'ওই তোর ওই রবি কাকাই চোর। আমাদের চুরি করে এনে বন্দী করে রেখেছে।'

মেয়েটা আর একবার হি-হি করে হেসে বলে, 'মানুষকে বুঝি চুরি করা যায়? মানুষ বুঝি টাকাপয়সা?'

'তাই তো দেখছি,—বটু বলে, 'তোকেও একদিন নিয়ে যেতে পারে।'

'ইঃ। আমার মা কাঁদবে না?'

শানু মাথা নেড়ে ছলছল চোখে বলে, 'মায়েরা তো কাঁদবেই! আমার মাও তো কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন।'

'তা তুমি চলে যাচ্ছ না কেন? বোকা বুদ্ধু! তোমার মা কাঁদছে, তোমার মনে দুঃখু হয় না?'

'কি করে যাব শুনি?' শানু রেগে ওঠে, 'তুইও একটা বুদ্ধু গাধা ভূত। বললাম না আমরা বন্দী হয়ে আছি।'

মেয়েটার চোখে হঠাৎ যেন একটা আলো খেলে যায়! বলে, 'আমি খুলে দেব দরজা?'

'তোর ভারী সাধ্যি, পুঁচকে চড়াই। তালায় তোর হাত যাবে?

'টুলে উঠে হাত দেব।'

'হুঁঃ! তার মানে পড়ে হাতপা ভাঙবি।'

'ইস্! ভাঙব বৈ কি। একদিন বুঝি আমি টুলে উঠে ভাঁড়ার ঘরের তালা খুলিনি? একদিন মা না, আমাকে না বামুনদির কাছে কাছে ফেলে রেখে না,—মেয়েটা হি-হি করে হেসে ওঠে, 'মামার বাড়ী চলে গিয়েছিল। আর বামুনদি না ঘুম লাগিয়েছিল। আমি তখন ভাঁড়ার ঘরের তালা খুলে আমের মোরব্বা আর কিসমিসের আচার—হিহি হি! আবার বলে কিনা পড়ে পা ভাঙব।'

হঠাৎ বটুর মনে একটা আশার সঞ্চার হয়। ব্যগ্র হয়ে বলে, 'বাঃরে তুই তো তা'হলে খুব ওস্তাদ মেয়ে! তা' দে না আমাদের দরজাটা খুলে।'

'আচ্ছা চাবি আনছি—'বলে মেয়েটা জানলার কাছ থেকে নামে।

'এই এই শোন—' বটু বলে, 'চাবি কোথায় পাবি?'

'আমাদের বাড়ীতে অনেক চাবি আছে। মার বাবার বামুনদির, —মেয়েটা ছুট দিতে যায়।

বটু আবার ডাকে। জানলার কাছে এসে চুপি চুপি বলে, 'সে চাবিতে হবে না! তোর এই রবি কাকার চাবি কোথায় আছে তা জানিস্?'

'হুঁ-উ-উ! ওই তো রবি কাকার রালিশের তলায়।'

'সেই চাবি নিয়ে আয়, বুঝলি!'

'আচ্ছা।' বলে মেয়েটা হাওয়া হয়।

অনেকক্ষণ আর পাত্তা পাওয়া যায় না মেয়েটার।

বটু বলে, 'মেয়েটা পাজীর পাঝাড়া। মিছিমিছি করে আমাদের ভুলিয়ে পালিয়ে গেল।'

শানু দুঃখিত হয়। বলে—'অমন সুন্দর ছোট্ট মেয়ে কখনও পাজি হয়? ও নিশ্চয় চাবি খুঁজে পাচ্ছে না।'

'চাবি খুঁজতে খুঁজতে যম এসে যাবে।'

যম মানে অবশ্যই সেই ড্রাইভার। যে নাকি নেহাৎই অনেক-গুলো টাকার লোভে এদের আটকে ফেলেছিল। সে তখন সেই চিঠি হাতে করে গিয়েছে শানুদের বাড়ী!

সেও বোকারাম।

এ বুদ্ধি নেই, ছেলে চক্ষে না দেখে কেউ টাকা দেয়? অথচ ও ভাবছে 'আমি বাবা খুব চালাক। ছেলে পেয়ে যদি আর টাকা-কড়ি না দেয়, তার থেকে আগেই টাকাটা নিয়ে নিই।'

যে যার নিজের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। এদিকে কষ্ট শুধু শানুদের।

বটু বলে, 'নির্বুদ্ধির দশা ধরেছিল আমার, তাই টাকার আশায় তোর সঙ্গ ধরেছিলাম। আমার ভাগ্যে আবার টাকা! জন্মের হতভাগা আমি। বাড়ার ভাগ এখন কপালে হাজার কষ্ট।'

শানু মনক্ষুণ্ণ হয়ে বসে থাকে।

হঠাৎ সেই মেয়েটা ছুটে এসে হাজির। হাতে একটা দড়িতে বাঁধা একটা চাবি। সেটা হাতে ঝুলিয়ে বলে, 'এই যে চাবি। উঃ এমন লুকিয়ে রেখেছিল রবি কাকা! খুঁজেই পাই না। রোসো এইবার দিচ্ছি খুলে।'

তারপর শানুরা একটা টুল টানাটানির ঘর-ঘর আওয়াজ আর চাবি নাড়াচাড়ির কুড়কুড়ু আওয়াজ পায়, আর একটু পরেই খুলে যায় দরজাটা!

বটু বেরিয়ে এসে 'ওরে আমার সোনারে!' বলে মেয়েটাকে কোলে তুলতে যায়, কিন্তু সে তিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'আঃ!...এত বড় মেয়েকে আবার কোলে করা কি? ছাড় শীগগির।'

'ওরে বাবা, এ যে সাংঘাতিক মেয়ে!' বটু বলে।

শানু বলে, 'এই, তুই দরজা খুলে দিলি, তোর রবি কাকা মারবে না ?'

'ইস্। মারবে বৈ ক। আমি আরও জোরে মেরে দেব না তাহলে ? লোককে বন্দী করে রেখে দেবে, আর আমি খুলে দেব না ? আবদার !'

'তাহলে আমরা পালাচ্ছি, বুঝলি ?'

'যাও না।'

মেয়েটা শানুর গায়ে একটা ধাক্কা দেয়।

শানু আর বটু বেরিয়ে গলিতে আসে

ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে গলি ছাড়ে। যেন তারাই চোর। বাইরে এসে বটু বলে, 'মেয়েটা যেমনি লক্ষ্মী, তেমনি দুষ্টু। কি জানি বেচারা বকুনি টকুনি খাবে কি না। রবিবাবু তো পাঁচ হাজার টাকার আশায়—হি হি হি। কিন্তু কী চালাক—ওইটুকু মেয়ে।'

'ইস মেয়েটার নামটাই জানা হ'ল না।'

'এই শানু, নাম পরে ভাবিস, পা চালিয়ে চল।'

শানু বলে, 'এবার আমি নিশ্চয় বাড়ী চলে যাব। বটুমামা, তুমি আর কোথাও আমায় নিয়ে যেতে পারবে না।'

বটু বিষণ্ণভাবে বলে, 'নাঃ আর কোথাও নিয়ে যাব না। কিন্তু কি করে যাব তোদের বাড়ী তাই ভাবছি। পকেটে তো একটাও পয়সা নেই। আর ট্যাক্সী চড়তেও ভরসা হচ্ছে না। এদিকে তোর কোনও আপনার লোকের বাড়ী আছে যেখানে হেঁটে যাওয়া যায় ?'

শানু অবাক হয়ে বলে, 'এদিকটা কোন্ দিক জানি আমি ?'

বটু বলে, 'এটা হচ্ছে বরানগর।'

'বরানগর। বরানগর কি নামই শুনিনি আমি।'

'মুস্কিলে ফেললে। তোর নিজের বাড়ী ছাড়া মাসী-পিসী মামা কেউ কোথাও নেই ?'

'থাকবে না কেন ?' শান্তু জোর দিয়ে বলে, 'আছে না আবার ? খুব আছে।'

'কোথায় থাকে তারা ?'

'বড়মাসী রাঁচিতে, মেজমাসী শিলিগুড়িতে, আর পিসীমা তো এলাহাবাদে—'

'থাম থাম, আর বলতে হবে না। চমৎকার! একেবারে পায়ে হেঁটে চলে যাবার পথ! বলি কলকাতায় তোর কেউ কোথায় নেই ?'

'নেই বৈ কি! খালি খালি বাজে কথা। শ্যামবাজারে মানার বাড়ী নেই ? বলিনি তোমায় ?'

'ওরে আমার সোনা ছেলে, আছে ? শ্যামবাজারে আছে ? তা'হলে চল হাঁটা মারি। বলেছিলি বুঝি ? মনে নেই তো! কত নম্বর – কোন্ রাস্তা ?'

'বারো নম্বর অনাদি মিত্তির লেন।'

'সেটা কোনখানে হবে কে জানে। যাক এগোনো তো যাক।'

কিন্তু এগোলেই কি হল ?

শান্তু পারে অত হাঁটতে ?

একটু গিয়েই সে কাতর হয়ে পড়ে।

'তবে না হয় একটা রিক্শ করি—' বটু বলে, 'তোর মামার বাড়ীটা চিনতে পারবি তো ?'

'মামার বাড়ী চিনতে পারব না ? তুমি পাগল না মাথা খারাপ ? পাঁচ মাথার মোড়ের কাছেই সেই লাল-চূড়োওলা বাড়ীটার পাশের গলি না ?'

অতএব বটু একটা রিক্শই নেয়।

চড়ে বসে বলে, 'যদি তিন-চার টাকা ভাড়া চেয়ে বসে, তোর মামারা দেবে তো ? না দিলে তো মহা বিপদ—'

'দেবে না ? একশো, দুশো, হাজার টাকা দিয়ে দেবে। এতদিন পরে এলাম আমি। দিদিমা তো ছুটে এসে—'

'ঠিক আছে, চল বাবা! এখন বাড়ীটা পেলে বাঁচা যায়! এই রিক্‌শওলা, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়।'

এদিকে তখন শানুর বাবা মাথায় হাত দিয়ে রয়েছেন। সেই ড্রাইভার রবিদাস, সে এসেছে শানুর চিঠি নিয়ে। পাঁচটি হাজার টাকা আগে পকেটে পুরে, তবে সে শানুর বাবাকে নিয়ে যাবে তাঁর ছেলের কাছে।

সাফ সাফ কথা তার।

'ছেলে পেয়ে আপনি যদি টাকা দেবার বদলে আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেন? যদি বলেন আমিই ছেলে চোর? তখন? টাকাটি দিন, এই আমার ট্যাক্সীতেই নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। সেখানে আপনার ছেলে আছে, আর একটি ধুরন্ধর ছোকরা আছে।'

'ছোকরা? তার সঙ্গে আবার কোন্ ছোক্‌রা?'

'কি জানি। মনে হচ্ছে সেই ছোকরাটা ভুলিয়ে-ভালিয়ে আপনার আপনার ছেলেকে—মানে হাওড়া ষ্টেশন থেকে তারা যখন আমার ট্যাক্সীতে উঠল, তখনই ছোকরার কথাবার্তা শুনে—'

'দেখ সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি যখন আমাকে সন্দেহ করছ, আমিই বা তোমাকে বিশ্বাস করি কি করে? তার চেয়ে চল আমরা তোমার সঙ্গে যাই, টাকাটাও নিয়ে যাই। আমি যেই আমার ছেলেকে হাতে পাব, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও টাকাটা পেয়ে যাবে।'

কিন্তু রবিদাসের এটা পছন্দ হচ্ছে না।

টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। তাছাড়া 'আমরা যাই' কথাটাও ভারী অপছন্দের। আমরা আবার কেন, শুধু 'আমি' হলেই তো ছিল ভাল। কে জানে বাবা ওই 'রা'য়ের মধ্যে পুলিশী ব্যাপার কিছু থাকবে কি না। তাই সে বলে ওঠে, 'আপনারা মানে? কে কে?'

ঠিক এই কথার মাঝখানে শানুর মা এসে ঢুকলেন বাইরে থেকে।

পাশেই একটা বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন শানুর মা। 'বেড়াতে' আর কি-সেই শানুর জন্যেই পাগলামী। কে যেন বলেছে কোন খবরের কাগজে একটা ভীড়ের ছবি ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে একটা ছেলের ঠিক শানুর মত মুখ! সেই কাগজ দেখতে গিয়েছিলেন শানুর মা। দেখে তো রেগেই উঠেছিলেন, 'এই আমার শানু? শানুর এই রকম মোটা খ্যাদা নাক? এই রকম খোঁচা খোঁচা চুল? শানু আমার এত বড় নাকি? এতো একটা বারো-চোদ্দো বছরের ছেলে!'

সেই রাগ-রাগ মুখ নিয়ে বাড়ী এসেই শানুর মা থমকে দাঁড়ালেন। এ কে!

'দেখ এই চিঠিটা ইনি এনেছেন।' শানুর বাবা শানুর লেখা সেই চিঠিটা এগিয়ে ধরেন।

'এ কী! এ কী! এ যে আমার শানুর হাতের লেখা!'

বসে পড়লেন শানুর মা ধুলোর ওপর।

রবিদাস তো থতমত।

তারপর শানুর মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ চিঠি কোথা থেকে এল? কোথায় আমার শানু? চিঠিটা এনেছ তো শানুকে আননি কেন? টাকার জন্যে আমার শানুকে তুমি আটকে রেখে এসেছ? শীগ্‌গির নিয়ে চল আমায় শানুর কাছে, যত টাকা চাও দেব। বাবু যদি না না দেন, আমি আমার সব গহনা-টহনা দিয়ে দেব। চল চল শীগ্‌গির। দেরী করছ কেন তোমরা?'

শানুর বাবা গম্ভীরভাবে বলেন, 'ইনি বলছেন আগে টাকা নেবেন, তবে শানুকে—'

'কী? আমার শানুকে নিয়ে এইসব দরাদরি ব্যবসাদারী?' শানুর মা ফেটে পড়েন, 'আমি এক্ষুনি পুলিশে ফোন করছি, দেখি কেমন না আমায় নিয়ে যাও।'

ছুটে ফোনের কাছে গিয়ে শানুর মা ডায়াল ঘোরাতে বসেন।

তখন শান্তুর বাবাই বাধা দেন, বলেন, 'উতলা হয়ো না, মাথা ঠাণ্ডা করো। আমি যা বলছি, তাই হোক। শুনুন আপনি, আমি আর এই ছেলের মা দুজনে আপনার সঙ্গে যাই। দেখি সত্যি আমার ছেলে ঠিক মত আছে কি না, এ চিঠি জাল কি না। তারপর ওই যা বলেছি—এ হাতে ছেলে নেব, ও হাতে টাকা দেব। নচেৎ থানা পুলিশ করে একটা ঝঞ্ঝাট সুরু হয়ে যাবে।'

অগত্যাই রবিদাসকে এঁদের দু'জনকে ট্যাক্সীতে তুলতে হয়। তবে দেখে নিতে ভুলে না শান্তুর বাবা টাকা সঙ্গে নিচ্ছেন কি না।

এদিকে শান্তুর বাবার ভাবনা হচ্ছে কি জানি লোকটা গুণ্ডার আড্ডার কি না। চিঠিটা জাল কিনা। আমাদের দু'জনকে নিয়ে যদি ওদের আড্ডায় তুলে টাকা গহনা কেড়ে নেয়?

কিন্তু একটা কথা।

শান্তুর হাতের লেখা জাল করবে কি করে? জীবনে কি ও শান্তুর হাতের লেখা দেখেছে? ও কি শান্তুর স্কুলের কোন দুষ্টু পিয়ন টিয়ন? স্কুলের খাতা টাতা দেখেছে?

তাই কি সম্ভব?

যাক যা করেন ভগবান!

গাড়ী এগোতে থাকে।

বালিগঞ্জ থেকে বরানগর কম রাস্তা তো নয়।

কিন্তু দূর ক্রমশঃ কাছে এল।

পৌঁছে গেল গাড়ী।

শান্তুর মা নেমে পড়ে আকুল হলেন, 'কই? কোথায়? কোন্ বাড়ীতে আটকে রেখেছ তুমি আমার শান্তুকে?

'আহা হা আটকে রাখব কেন?' রবিদাস বলে, 'বাড়ীর মধ্যেই আছে। আনছি।'

আসল কথা চাবি বন্ধ দরজার দৃশ্যটা আর দেখাতে ইচ্ছে নেই

তার। কিন্তু কে করছে অপেক্ষা? শান্তুর মা ওর পিছন-পিছন বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে সুরু করেছেন। অগত্যা শান্তুর বাবাও।

কিন্তু? কিন্তু যে কী সে তো তোমরা আগেই জানো। শান্তুর মা আর বাবা দেখলেন শুধু একটা অন্ধকার মত ঠাণ্ডা একতলা ঘর, তাতে একটা ময়লা বিছানা সমেত চৌকী পাতা, ঘরের মেজেয় দুটো শালপাতার ঠোঙা গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর ঘরের দরজায় একটা কড়ায় একটা চাবিসুদ্ধু ভারী তালা ঝুলছে।

'কই কোথায়? কোথায় ছেলে?'

শান্তুর মা বাবা দু'জনেই চেঁচিয়ে ওঠেন।

রবিদাসের তো মাথায় বজ্রাঘাত!

এ কী! পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা হাতে এসে পিছলে পালিয়ে গেল? তালা কে খুলে দিল? কোথায় চলে গেল ছেলে দুটো?

'তোমায় আমি পুলিশ দেব।' বললেন শান্তুর বাবা। তুমি ছেলেকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিয়ে তাকে সরিয়ে ফেলে পুরস্কারের টাকাটি বাগাতে গিয়েছিলে। দেখছি—আমার এই এত টাকা পুরস্কার ঘোষণাই ভুল হয়েছিল।'

রবিদাস দুই হাত জোড় করে বলে, 'বাবু, বিশ্বাস করুন, এই একঘণ্টা আগেও ছিল। আমি যখন বেরিয়েছি তখন বলে গেছি—'

'তবে কোথায় গেল সে? পাখী হয়ে উড়ে গেল?'

'পাখী হবে কেন, এই তো দিব্যি দরজা খোলা। ভগবান জানেন কে তালা খুলে—'

'থাক তুমি আর ভগবানের নাম মুখে এনো না'—শান্তুর মা বলে ওঠেন, 'বল শিগ্‌গির কোথায় গেল আমার ছেলে?'

শান্তুর বাবা বলেন, 'চালাকী পেয়েছ তুমি? আমাকে বোকা বোঝাচ্ছ? এখন বুঝতে পাচ্ছ কেন তোমার হাতে আগেই টাকাটা দিই নি?'

রবিদাস যতই বোঝাতে চেষ্টা করে, আসলে সে নিজেই জানে

না কে দরজা খুলে দিয়েছে, শান্তুর বাবা ততই বকাবকি চেঁচামেচি করতে থাকেন। পাড়ার লোকজন এসে দাঁড়ায়। রবিও সকলের দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'কে এ ঘরের তালা খুলে ছেলেদুটোকে বার করে নিয়ে গেছে? বল—বল শিগগির। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যেই কেউ ওই পুরস্কারের লোভে এই কাজটি করেছ। বল বল—কে?'

ঠিক এই সময় পাশের বাড়ীর দোতলা থেকে পিছনের দরজা দিয়ে ছুটে আসে সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটা। এসে দাঁড়িয়ে দুই চোখ পাকিয়ে ডান হাতের আঙ্গুল তুলে জোরগলায় বলে ওঠে, 'মিছিমিছি সবাইকে বকছ কেন রবিকাকু? তুমি ওদের বন্দী করে রেখে দেবে, আর আমি খুলে দেব না? আবদার!'

শান্তুর মা ছুটে এসে ওর হাত ধরে কেঁদে ফেলে বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। খুব লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। কিন্তু তুমি দরজা খুলে না দিলে, সে তো চলে যেতে পারত না। কোথায় সে চলে গেল বল?' কোনখান থেকে আবার তাকে খুঁজে পাব আমি?'

মেয়েটা শান্তুর মার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি বুঝি ওদের মা?'

'ওদের কি! শুধু তো আমার শান্তু।' শান্তুর মা আবার কাঁদছেন।

মেয়েটা গম্ভীরভাবে বলে, 'বুঝেছি, তুমি সেই ছোট্ট ফরসা ছেলেটার মা। কিন্তু তুমি এত বোকা কেন? তোমার ছেলে বন্দী থেকে খোলা পেয়ে অন্য আবার কোথায় যাবে? তোমাদের বাড়ীতেই গেছে।'

'হে ভগবান তাই যেন হয়। ওগো চল চল,—যাই বাড়ীতে।'

শান্তুর বাবা বলেন, 'সে আশা নেই। ওই শুনছ না আর একটা ছেলে আছে সঙ্গে। সেইটাই নিশ্চয় আসল বদ। আমাদের ইনি চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গিয়েছিলেন, সুবিধে করতে পারলেন না। সে ছোকরা আবার কোথায় ভুলিয়ে নিয়ে গেছে কে জানে। তা ছাড়া—শান্তু কি আর এখান থেকে পথ চিনে সেখানে যেতেই পারত! ভগবান কূলে এনে তরী ডোবালে?'

হঠাৎ মেয়েটা চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ কী তুমি এমন কাঁপছ কেন? তুমি যে পড়ে যাচ্ছ।'

হ্যাঁ সত্যিই শানুর মা কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাচ্ছিলেন, সবাই ধরে ফেলল। অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

'এখন উপায়! গাড়ী—গাড়ী চাই একটা।' বলেন শানুর বাবা।

একটা লোক বলে ওঠে, 'আরে এই তো রবিরই গাড়ী রয়েছে—'

কিন্তু কোথায় রবি?

সে এই গোলমালের মধ্যে এক ফাঁকে সরে পড়ে গাড়ী নিয়ে হাওয়া। শানুর মায়ের অবস্থা দেখে তার চৈতন্য হয়েছে, কেন শাস্ত্রে বলে 'লোভে পাপ'। তার লোভের জন্যই তো আজ এই ভদ্রমহিলার এই অবস্থা। ও যদি টাকার লোভ না করে সোজাসুজি গাড়ী চালিয়ে ছেলেদুটো যেখানে বলছিল সেখানেই নামিয়ে দিত, এত ঝঞ্ঝাটে পড়তে হ'ত না। আর এই ছেলে-হারানো মায়ের কষ্টটাও দেখতে হ'ত না। হয়তো পুরস্কার কিছু পেতও।

পাপ হয়েছে তার—অনেক পাপ হয়েছে।

এখন পুলিশ এসে হাজির হলে, শাস্ত্রের সবটুকুই ফলে। 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'—পুলিশের হাতে পড়া মানেই মৃত্যু। তার থেকে সরে পড়াই ভাল।

ও যখন বোঁ করে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় অনাদি মিত্তির লেনের একটা পুরানো আমলের প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে একটা রিক্‌শ গাড়ী থামল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে হাসি-কান্না-চেঁচামেচির মিক্‌শ্চার একটা বিরাট সোরগোল উঠল—'শানু!...শানু এসেছে!...শানু বেঁচে আছে, ভাল আছে।'

শানুর দিদিমা ছুটে আসতে আসতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্...শীগ্‌গির কেয়াতলায় খবর দে।...বৌমা, শাঁখ বাজাও—শাঁখ বাজাও।'

বার

হাসিকান্না আদর বকুনি সোরগোল শঙ্খরোল সবের মাঝখানে হাবুডুবু খাচ্ছে শানু, আর বটু বেচারা সরে গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই কলকল্লোলের মধ্যে যে তার কোনও জায়গা নেই তা সে বুঝে ফেলেছে। চলেই যেত সে, শুধু শানুর সঙ্গে একবার শেষ দেখা না করে তো আর যাওয়া যায় না! তাই অপেক্ষা করছে—কখন একটু একা পাবে শানুকে।

কিন্তু কোথায় শানু? তাকে তো প্রায় রবারের বলের মত এ হাত থেকে ও হাতে লোফালুফি করা হচ্ছে। এরই মাঝখানে প্রশ্নের পর প্রশ্ন: কোথায় ছিলি এতদিন? কি করেছিলি? কি খেয়েছিলি? কে তোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল? কে তোকে চুরি করেছিল?—সে একেবারে প্রশ্নের শরশয্যা!

এরই মাঝখানে কে একজন এসে বলল, 'শানুদের বাড়ীতে ফোন করে সাড়া পাওয়া গেল না, বাড়ীতে কেউ নেই।'

শানুর দিদিমা হৈ-চৈ করে উঠলেন, 'ওমা ওমা, ছেলে ছেলে করে পাগল হচ্ছিল, আর ছেলে যখন নিজে এসে হাজির হল তখন আর পাত্তা নেই? কোথায় গেল এমন সময়?'

কোথায় গেল তা আর কে জানবে? তাই পাঁচ মিনিট অন্তর টেলিফোনের ডায়াল ঘোরানো হতে থাকে, শানুর মা-বাবাকে খবর দেবার জন্যে।

এরই অবসরে বটু আস্তে আস্তে এসে উঁকি মারে। শানু কাছে আসে, বলে, 'এ কি তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছ যে? ভেতরে এস। চল আমার দিদিমাকে চিনিয়ে দিই।'

বটু ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না রে ভাই না, আমি পালাই। তোর সঙ্গে একবার দেখা করব বলে—'

'পালাবে মানে?' শান্তু ওর হাত চেপে ধরে বলে, 'মা-বাবার সঙ্গে দেখা না করে—'

'না না, আমি দেখা করব না। এমনিতে লজ্জায় মাথাকাটা যাচ্ছে আমার—'

'মাথা কাটা যাচ্ছে? মাথা কাটা যাচ্ছে তোমার?' হি-হি করে হেসে ওঠে শান্তু, 'দিব্যি আস্ত মাথাটাই তো রয়েছে দেখছি। এক ইঞ্চি চুলও তো কাটা যায় নি। লজ্জা! লজ্জা কিসের? তুমি আমার বন্ধু না?'

বটু মলিনমুখে বলে, 'আগে তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি তা হয় না।'

'হয় না? হয় না মানে?' শান্তু অবাক হয়ে তাকায়।

বটু গম্ভীর-বিষণ্ণমুখে বলে, 'বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। তুই আর আমি কি সমান? তুই কত বড়লোকের ছেলে, সকলের কত আদরের ছেলে, আর আমি? জগতের ওঁচা। তুই হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলি বলে শাঁখ বাজল, আর আমি যদি এখন এই মুখ নিয়ে আবার বাড়ী ঢুকি, বাড়ীর লোক জুতো নিয়ে তেড়ে আসবে। আমি হবো তোর বন্ধু! হুঁ!'

চোখ ছলছল করে আসে বটুর।

শান্তু একটুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, 'হবো' আবার কি? হয়েই তো গেছ। একবার বন্ধু হয়ে গেলে, আবার বদলানো যায় নাকি? ডিংলাই তো কত কালো, একেবারে অন্য রকম, তা বলে কি ডিংলাই আমার বন্ধু নয়?'

'ডিংলাই!' বটু বলে, 'ওঃ সেই সাঁওতাল না কাদের যেন ছেলেটার কথা বলছিস? তা তার সঙ্গে আর তোর দেখা হচ্ছে কোথা? জীবনেও হবে না হয়তো।'

'হবেনা ? ইস্। হবে না বৈ কি। আমি বড় হয়ে নিজে নিজে রেলে চড়ে যেতে পারব না বুঝি ? খুঁজে বার করব না বুঝি তাকে ?'

'তুই বড় হয়ে তাকে খুঁজে বার করবি ?'

হেসে ওঠে বটু। বলে, 'তুই এখনো নেহাৎ বাচ্ছা আছিস। পৃথিবীটা যে কী তা এখনো টের পাস নি। বড় হয়ে তোর এসব কথা মনে করে হাসি পাবে।'

'হাসি পাবে ? তুমি আমায় ভেবেছ কি তাই শুনি ? দেখো না বড় হলে।'

শানু জোরালো গলায় বলে ওঠে।

বটু কি যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ বাইরের দিকে মস্ত একটা সোরগোল ওঠে, অনেকগুলো গলায় একটা কথা বেজে ওঠে, 'সে কী। সে কী। কী কাণ্ড।'

কাণ্ডই সত্যি।

শানুর মাকে ধরে ধরে গাড়ী থেকে নামানো হচ্ছে।

আর দাঁড়ায় শানু ?

সে বিদ্যুতের মত ছুটে গিয়ে দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে, 'মা মা।'

সেই কতদিন আগে দীঘায় মাকে না বলে চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরিয়ে বালির চরে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর এই দেখা।

'মা মা মা।' মার বুকে মুখ-মাথা ঘসতে থাকে শানু।

আর শানুর মা ? শানুর বাবা ?

তাঁদের অবস্থা তোমরা নিজেরাই বুঝে নাও। অনেক কথা আর অনেক চোখের জলের পর আবার যখন সবারই মুখে হাসি ফোটে, তখন শানু ছুটে দেখতে আসে বটু কোথায়।

বটু তখন বাড়ীর বাইরের রোয়াকে চুপটি করে বসে আছে। চলে যাবে যাবে করে পা বাড়াচ্ছে আর মনটা টানছে শানুর দিকে। শানু বলেছে শানুর মা-বাবাকে না দেখে যাওয়া চলবে না। সত্যি, সেটা উচিতও। একবার অন্ততঃ তাঁদের বলে যেতে হবে এমন ছেলে

বটু কখনো দেখেনি। স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবদূত যেন।

বলবে এ ছেলের মা-বাপ ধন্য।

তাই ভীড়ের পিছনে একটি পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

তখন শানুর মা বসে পড়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন, 'শানু শানুরে, কত দুঃখু তুই দিলিরে আমায়। শানু সোনা কী চেহারা হয়েছে রে তোর?'

এসব কথার শেষ নেই।

শানুর ছোটমামা এসে বলেন, 'তা তোর সঙ্গের ওই ছোঁড়াটা কে রে?'

'ছোঁড়া মানে?' শানু সবেগে দাঁড়িয়ে ওঠে, 'ও তো আমার বন্ধু।'

'বন্ধু? আহা-হা চুক্ চুক্। তুই যেমন হাঁদা। ওই তোকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়েছিল না?'

'কক্ষণো না। ওর সঙ্গে তো আমার রেল গাড়ীতে দেখা। ও আমাকে খুঁজে এনেছে।'

'খুঁজে এনেছে?'

'না তো কি? আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম না? বটুদাই তো আমাকে খুঁজে নিয়ে এসেছে।'

বটু শুনতে পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভাবে শানুটা সরল শিশু, ও যা হোক বলছে। কিন্তু বাড়ীর বড়রা তো আর সরল শিশু নয়। তারা যে বটুর জন্যে কী ব্যবস্থা করবে কে জানে? উত্তম-মধ্যম, কিংবা শ্রীঘর। সকলেই তো কেমন সন্দেহ-সন্দেহ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বটুর দিকে।

শানুর বাবা তো সাতশো জেরা করলেন, শানুর বড়মামাও চুপি চুপি কী সব বলছিলেন ওর দিকে তাকিয়ে।

ওঁদের ধারণা বটু একটা হতচ্ছাড়া রাস্তার ছেলে, শানুকে ভুলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল, নেহাৎ পাকে চক্রে শানু উদ্ধার হয়েছে। যাক্ উদ্ধার তো হয়েছে। ওঁরা তাই চুপি চুপি বলাবলি করেন, 'থাক,

থানা পুলিশ করে আর দরকার নেই, শানুকে তো দেখছি বেজায় হাত করেছে। ওকে এখন পুলিশে হ্যাণ্ডোভার করতে গেলে শানু ক্ষেপে যাবে। বরং দু'টো সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়ে ছেড়ে দাও।'

হাঁ তাই দিচ্ছিলেন সবাই, কিন্তু হঠাৎ শানু চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ও কী, চলে যাচ্ছ যে বটুদা? টাকা নিয়ে যাও।'

টাকা! ওকে আবার টাকা দিয়ে বিদেয় করতে হবে নাকি? সদ্ ব্রাহ্মণ? ভোজন-দক্ষিণা?

শানুর মামারা তেড়ে আসেন, 'টাকা কিসের?'

'বাঃ তোমরা খবরের কাগজে লেখনি, যে আমাকে খুঁজে দেবে, তাকে তোমরা পাঁচ হাজার টাকা দেবে?'

হ্যাঁ তা তাঁরা লিখেছিলেন! স্বীকার পেলেন।

কিন্তু বটুকি শানুকে খুঁজে এনে দিয়েছে?

'শানু, নিজেই তুমি বলনি রেলগাড়ীতে দেখা।'—বলেন বড়মামা।

'তাতে কি?' শানু সতেজে বলে, 'আমি বলছি—ও আমায় খুঁজে দিয়েছে।'

'তোকে বোকা বুঝিয়েছে ছোঁড়া—!'

'ছোঁড়া! আবার ওই সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা? ঠিক আছে, তোমরা দিও না টাকা, আমি আবার চলে যাচ্ছি বটুদার সঙ্গে—'

শানু বীরবিক্রমে গিয়ে বটুর হাত চেপে ধরে, 'চল বটুদা—আমরা আবার হারিয়ে যাই। মিথ্যুকদের সঙ্গে থাকবার দরকার নেই আমাদের। দেবে বলে দেয় না—'

এখন বুঝতেই পারছ ব্যাপার!

পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা, কম তো নয়! যখন শানুকে পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন মনে হয়েছিল, তার বদলে পৃথিবী দেওয়া যায়, কিন্তু এখন ঘরের ছেলে ঘরে এসে গেছে, এখন মনে হচ্ছে খামোকা

ওই রাস্তার হতভাগা ছোঁড়াটাকে অতগুলো টাকা দিতে যাব কেন? ও কি সত্যি খুঁজে এনেছে শানুকে? শুধু দৈবক্রমে পথে দেখা হয়ে গিয়ে ভারী দেখি মাথা কিনেছে! শানুটা বোকা।

কিন্তু বোকা কি বটুই নয়?

সেও তো শানুর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে মিনতি করছে, 'ছাড় ভাই ছাড়, আমার টাকা চাই না। তুই যে তোর মার কাছে এসে পেঁৗছেছিস এই আমার আনন্দ।'

'ইস ছাড়ব বৈ কি? টাকা না হলে তুমি কাঁচের দোকান করবে কি করে শুনি?'

'শানু চলে এস।'—বড়মামা গম্ভীরকণ্ঠে বলেন।

ছোটমামা বলেন, 'শানু ছেড়ে দাও ওকে, বেশী গোলমাল করলে ওকে পুলিশে দেওয়া হবে।'

দিদিমা বলেন, 'ছোঁড়া আমার শানুকে তুক্‌তাক কিছু করে নি তো?'

শানুর বাবা বলেন, 'শানু, তুমি ছেলেমানুষী ক'রো না। আমি বলছি টাকা ওর পাওনা হতে পারে না।'

আর শানুর মা বলে ওঠেন, 'ওগো শানু যখন বলছে, দাও না ওকে কিছু দু'-তিন শো চারশো যা হোক।'

শানুকে এঁরা টেনে আনতে যান, বটুও শানুকে ছাড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু শানুর মুঠো এখন বজ্র।

'কক্ষণো না! যাব না তোমাদের সঙ্গে, থাকব না তোমাদের কাছে। মিথ্যুকদের কাছে থেকে দরকার নেই আমার। খবরের কাগজে লেখা হল পাঁচ হাজার টাকা, এখন কি না 'আহা-হা দিয়ে দাও না দু'-তিন শো!' কেন? বটুদা কি ভিখিরী? চল বটুদা, চল। আমরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিগে।'

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবি?' শানুর মা কেঁদে ফেলেন। 'এতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তোর আশ মেটেনি শানু? আমাকে ছেড়ে

আবার চলে যাবার কথা মুখে আনছিস তুই? আনতে পারছিস?'

'তা কি করব?' শান্তুর বুনো গোঁ, 'তোমরা যেমন, তেমনি শাস্তি।'

'শান্তু, আমায় ছাড় ভাই।'

টানাটানি করছে বটু। শান্তু প্রবল, বলে, 'না না! আমরা চলে যাব।'

শান্তুর বাবা এসে গম্ভীরভাবে বলেন, 'শান্তু, আমাদের চেয়ে ও তোমার বেশী আপন হল?'

'হলই তো। ও আমার বন্ধু।'

দিদিমা কপালে হাত চাপড়ে বলেন, 'আর কিছু না, ছোঁড়া নির্ঘাৎ তুক করেছে। সেই যে কী যেন বশীকরণ মন্তর আছে, তাই পড়েছে। নইলে এতদিন পরে মা-বাপ পেয়েও এমন করে?'

অতঃপর বড়রা চুপি চুপি পরামর্শ করেন, 'শান্তু যখন অত ক্ষেপেছে, দেওয়াই হোক টাকাটা, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেও খবর দেওয়া হোক, যাতে বাড়ীর বাইরে যেতেই পুলিশের হাত দিয়ে টাকাটা আবার কেড়ে নেওয়া যায়। সত্যি, শান্তু পাগল হয়েছে বলে তো আর বড়রা পাগল হন নি যে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা—'

'আচ্ছা ঠিক আছে, টাকা দিচ্ছি—' শান্তুর বাবা গম্ভীরভাবে বলেন শান্তুকে, 'কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করো, আর কক্ষণো মিশবে না ওর সঙ্গে। এই শেষ দেখা—'

হঠাৎ বটু কেঁদে ফেলে বলে, 'মিনতি করি আপনাদের, তার থেকে বরং টাকা দেবেন না আমাকে, শুধু মাঝে মাঝে শান্তুর সঙ্গে দেখা করতে দেবেন—'

কথা শেষ হয় না। শান্তু চড়া গলায় বলে ওঠে, 'টাকাও দেবেন, দেখাও করতে দেবেন। দেবেন না মানে? আবদার নাকি?··· বাবা, দাও দাও শীগগির টাকা, নইলে এই আমি চললাম।'

'শান্তু, তুই এত নিষ্ঠুর?'

'আহা-হা, আর নিজেরা কী দয়ালু? কেন, বলতে পারছ না—বটু, তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাক, টাকা নিয়ে দোকান টোকান করে তুমি বড়লোক হও। তুমি আমাদের শানুর বন্ধু।...তা নয়—তুমি চলে যাও। তোমায় টাকা দেব না!...ছাই ভালবাস আমায় তোমরা। টাকা দিতে হাত সরছে না! আর দেখ বটুদাকে? বটুদা শুধু আমার সঙ্গে একটু দেখা করবার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা ছেড়ে দিচ্ছে! এখন বুঝছি, বন্ধুই হ'চ্ছ আসল।...ব্যস বটুদা, চল আমরা আবার ঘুরে ঘুরে বেড়াইগে। ঘুরতে ঘুরতে ডিংলাইকে খুঁজে বার করব। তিন বন্ধুতে একসঙ্গে থাকব।'

'শানু, তুই পাগল?'

'বেশ তো তাই। পাগলই আমি। আর এঁরা সব খুব বুদ্ধিমান। চারটি টাকার জন্যে এতদিনের হারিয়ে-যাওয়া ছেলেটাকে আবার হারিয়ে ফেলছেন।'

'না আর হারিয়ে ফেলব না—' শানুর মা কাছে সরে আসেন। রবিদাস ড্রাইভারকে দেবার জন্যে যে টাকা সঙ্গে নিয়েছিলেন শানুর বাবা, সেই টাকাভরা পোর্টফোলিওটা তুলে দেন বটুর হাতে, ছলছল চোখে বলেন, 'আজ থেকে তুমিও আমার আর একটি ছেলে। শানুর মত আদরেই থাকবে আমার কাছে। আর এই টাকা নিয়ে দোকান টোকান যা করতে চাও করবে।'

শানুর মা বটুর হাত ধরেন।

ব্যস সকলে একেবার আঁকা ছবি! কারো মুখে কথা নেই।

শানুর মা নিজেই যদি পাগলামী করে বসেন, কার কি বলার আছে! এখন শুধু চুপি চুপি মন্তব্য—ছোঁড়াটা কী 'লাকি'!

অনেকক্ষণ পরে খাওয়া-দাওয়ার পর শানুদের বাড়ীতে এসে ওর পড়ার ঘরে বসে বটু বলে, 'এসব কি করলি বল দিকি?'

'ঠিকই তো করলাম। ছোটরা ভুল করলে বড়রা যেমন বুঝিয়ে

ঠিক করে, বড়রা ভুল করলে ছোটরাও তেমনি ঠিক করে দিতে পারে। বুঝলে বটুদা?'

'কিন্তু শানু, আমি কোন লজ্জায় তোদের বাড়ীতে তোর বন্ধু হয়ে থাকব? আমি তো তোদের চাকরের মত।'

'ছিঃ বটুদা!' নিজেকে অত নীচু ভাবতে আছে?' শানু সতেজে বলে, 'ওতে ভগবান রাগ করেন, তা জানো? আর—হি হি—তাই যদি হয়, তুমিও তোমার কাঁচের দোকানে আমাকে চাকর রেখো।—হি হি—আমি বাসনের ধুলোটুলো ঝাড়ব, আর লোকে কিনতে এলে বলব—তিন টাকায় হবে না—দশ টাকা চাই।'

বটু একটুক্ষণ ছলছল চোখে তাকিয়ে থেকে বলে, 'নারে শানু, তোর তো আর আমার মত মুখ্যু হয়ে থাকলে চলবে না, তোকে লেখাপড়া শিখতে হবে, মানুষ হতে হবে। আমি ঠিক করেছি তোর সেই ডিংলাইকে খুঁজে এনে দু'জনে দোকান চালাব।'

'সত্যি বটুদা? ইস! তুমি কী ভাল!...'

শানু উজ্জ্বল চোখে বটুর হাত ধরে। আর তার পরই আস্তে আস্তে ওর মুখটা ম্লান আর চোখটা উদাস উদাস হয়ে যায়। বলে, 'কিন্তু বটুদা, সত্যি কথা কি জানো? বাড়ী ভাল—খুবই ভাল, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া আরও ভাল।'

'হারিয়ে যাওয়া আরও ভাল! বলিস কি শানু?'

'সত্যি বটুদা! আবার আমার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে—সমুদ্দুরের ধারে ধারে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে, না-দেখা সব জায়গায়।'

'ইস! ভয় করে না তোর?'

'করে, কিন্তু ভয়ের মধ্যেও মজা আছে। দেখো বড় হয়ে আবার হারিয়ে যাব।'

'আবার হারিয়ে যাবি? চমৎকার! আর তোর মা?'

শানু মহোৎসাহে বলে, 'সে আমি ভেবে ফেলেছি। হারাবার সময় মাকে নিয়ে যাব।'